মাতৃদর্শন

ভাইজী

Published by Rajat Sen
IND BOOK Co.
44, Hazra Road, Ballygunge, Calcutta.

এক টাকা

Printed by Ganganarayan Bhattacharyya, at the Tapasi Press,
30, Cornwallis Street, Calcutta.

নিবেদন

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাতাজীর জীবনের বহু লীলার কথা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হওয়াতে, ভাইজীকে (৺জ্যোতীশচন্দ্র রায় I. S. O কে) আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার নিজ জীবনে তিনি শ্রীশ্রীমাতাজীর যে সকল লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ তিনি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

ভাইজী বলিতেন,—"বিরাট আকাশের মূর্ত্তি যেরূপ বহু জলাশয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে পড়িয়া থাকে, তাহা দ্বারা যেমন আকাশের বিরাট স্বরূপের ধারণা হয় না, তেমনি আমার এই ক্ষুদ্র আধারের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের করুণার যে ছায়াপাত হইয়াছে তাহার দ্বারা তাঁহার অনন্ত মহিমার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।"

তবুও আমার মনে হয় শ্রীশ্রীজননীর করুণার দুই এক বিন্দুর দ্বারাই আমাদের সকলের জীবন ধন্য হইতে পারে।

সন ১৩৩৭ সাল।

শ্রীঅটলবিহারী ভট্টাচার্য্য

সূচী

১। মাতৃ দর্শন ১
২। মন্ত্র বিভূতি ২৭
৩। ভাব বিভূতি ৩৬
৪। যোগ বিভূতি ৫৩
৫। সমাধি ভাব ৬৮
৬। লীলা-খেলা ৭৯
৭। আশ্রম ১২০
৮। নবজীবনের পথে ... ১৩৭
৯। অভিযান ১৫৫
১০। শ্রীশ্রীমা ১৫৯
১১। শ্রীশ্রীপিতাজী ১৬৭
১২। নিজের কথা ১৭০
১৩। শ্রীশ্রীমায়ের পরলোকগত ভক্তগণ ... ১৭৭

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা

মাতৃ দর্শন

শ্রীশ্রীমাতাজীর জীবনচরিত লিপি করা কিংবা লোক-চিত্তাকর্ষণের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তির পর্য্যালোচনা করা এই ক্ষীণ চেষ্টার উদ্দেশ্য নয়। আমার শুষ্ক হৃদয় কিরূপে তিনি প্রাণময় করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অল্প কয়েকটি কথা এই বইতে অবতারণা করিয়াছি মাত্র। আমি যাহা নিজে দেখিয়াছি বা আত্মপ্রত্যয়ে যাহা গ্রহণ করিয়াছি কেবল তদ্রূপ প্রসঙ্গই এই গ্রন্থে নিবিষ্ট হইয়াছে। আমার অযোগ্যতার দরুণ এই প্রবন্ধগুলির ভিতর ভাষা বা বর্ণনার যাহা অপরিপূর্ণতা বা ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে তজ্জন্য আমি মায়ের চরণে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অতি শৈশবেই আমি মাতৃহীন হই। শুনিয়াছি তখন কাহারো মা ডাক কানে পৌঁছিলে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিত; আর আমি ঘরের মেজে বুক রাখিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতাম। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগের প্রভাবে শিশুকাল হইতেই সদ্‌ভাবের বীজ আমার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আমি কুলগুরুর কৃপায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করি। তাহার ফলে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণে শান্তি পাইলেও,

"মা"ই যে জীবের সর্ব্বস্ব এ সত্যবোধ পরিস্ফুট হইত না। সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হইত এমন এক জীবন্ত বিগ্রহের সন্ধান চাই যাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টিতে এই বিক্ষুব্ধ জীবন স্বতঃই রূপান্তরিত হইতে পারে। সাধু-সন্তের তো কথাই নাই, জ্যোতিষী পাইলেও জিজ্ঞাসা করিতাম—"আমার এই সৌভাগ্য উদয় হইবে কি ?" তাঁহারা কেহ নিরাশ করিতেন না।

এই উপলক্ষে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিলাম, অনেক মহাত্মার সাক্ষাৎকার লাভের সুযোগ ঘটিল, কিন্তু কেহই এই দীনকে আকর্ষণ করিলেন না।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ঢাকা আমার কর্ম্মস্থান হইল; সেখানে আসিলাম। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে শুনিলাম সহরের নিকটস্থ শাহ্‌বাগ্‌ বাগানে কয়েকদিন ধরিয়া এক মাতাজী বাস করিতেছেন। তিনি অনেকদিন যাবৎ মৌনী আছেন—তবে কদাচিৎ যোগাসনে বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে কুণ্ডলী দিয়া আলাপাদি করেন। এক সুপ্রভাতে আকুল প্রার্থনা বুকে করিয়া শাহ্‌বাগ গেলাম এবং পিতাজীর সৌজন্যে মাতাজীর শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম। তাঁহার শান্ত যোগাবস্থা অথচ কুলবধূর ভাব এই দুইটি যুগপৎ এই প্রথম দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। আরো দেখিলাম যে যাঁহার প্রতীক্ষায় এতদিন বসিয়া আছি, যাঁহার খোঁজে দেশ বিদেশ ঘুরিয়াছি, তিনিই আজ আমার সম্মুখে। আমার মন প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া নাচিয়া

উঠিল। ইচ্ছা হইল, চরণে লুটাইয়া পড়ি আর কাঁদিয়া বলি—"মা, এতদিন কেন দূরে রাখিয়া দিয়াছিলে?"

কিছুক্ষণ পরে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার পারমার্থিক উন্নতির কোন আশা আছে কি?" মা বলিলেন—"ক্ষিদে তো এখনও পায় নাই।" কত কথা বলিব ও কত কথা শুনিব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু কি এক অপূর্ব্ব কৃপানুভূতিতে নির্ব্বাক হইয়া মুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলাম। দেখিলাম মাতাজীও নীরব রহিলেন। খানিক পরে হৃদয়াপ্লুত শ্রদ্ধায় নমস্কার করিয়া বিদায় নিলাম। চরণ ছুঁইতে প্রবল আগ্রহ হইলেও পারিলাম না; ভয়ে নয়, আশঙ্কায় নয়; কি যেন এক অব্যক্ত আবেগে সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিলাম।

শাহ্‌বাগ আর যাইতাম না। মনে হইত যতদিন না তিনি তাঁহার অবগুণ্ঠন সরাইয়া জননীর মত টানিয়া না লইবেন, ততদিন কেমন করিয়া তাঁহার চরণ বুকে জড়াইয়া ধরিব। একদিকে এই অভিমান, অপর দিকে দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা দুইএর দ্বন্দ্ব সমানে চলিতে লাগিল;—ইতিমধ্যে করিলাম কি, শাহ্‌বাগের নিকটস্থ শিখ্‌ আখ্‌ড়ায় যাইয়া সংলগ্ন দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া মাতাজীকে তাঁহার অজ্ঞাতে দুই দিন দেখিয়া আসিলাম। মনের এই অদ্ভুত গতিভঙ্গী দেখিয়া চিন্তা করিতাম,—এ কী হইতেছে, কিন্তু হিতাহিত বিচার করিবার কোন সামর্থ্য পাইতাম না। মার খবর সর্ব্বদাই পাইতাম; মাঝে মাঝে তাঁহার লীলার অনেক রকম প্রসঙ্গও শুনিতাম।

এইরূপে দৈনন্দিন কর্ম্মকোলাহলের ভিতর দিয়া সাত মাস কাটাইলাম। পরে একদিন মাকে আমাদের বাড়ীতে আনিলাম। বহুদিন পরে তাঁহাকে কাছে পাইয়া বেশ আনন্দ হইল; কিন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারিল না। বিদায়কালীন মার চরণ ছুঁইতে গেলে, তিনি বেগে পা দুখানি সরাইয়া নিলেন। প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম।

এই কয়মাস ধরিয়া বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় চিত্তকে সুস্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। হঠাৎ এক খেয়াল হইল যে ধর্ম্ম ও সদাচার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া ছাপাইব। সহসা "সাধনা" নামক এক পুস্তক তৈয়ারী হইয়া গেল এবং শ্রীমান ভূপেন্দ্রনারায়ণ দাশগুপ্তকে দিয়া মাতাজীর শ্রীচরণে এক কপি পাঠাইয়া দিলাম। মা তাহাকে বলিলেন—"বই খানির লিখককে আসিতে বলিও।" মায়ের ডাকে অপরিসীম উৎফুল্ল হইয়া একদিন সকালে শাহ্‌বাগে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম মাতাজীর তিন বছরের মৌন তখন কাটিয়া গিয়াছে। তিনি আসিয়া আমার অতি নিকটেই বসিলেন! বইখানি আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিলেন,—"যদিও মৌনাবস্থার পর আমার শব্দ এখনও ভাল করিয়া খুলে নাই, কিন্তু আজ আপনা হইতেই কথা আসিতেছে। বইখানি সুন্দর হইয়াছে, শুদ্ধভাবের বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিও।"

সেই দিন মাতাজীর পূত সান্নিধ্যলাভে এক নবীন চিত্র ভিতরে বাহিরে ফুটিয়া উঠিল; পিতাজীও উপস্থিত ছিলেন।

বোধ হইতে লাগিল যেন আমি আমার মাতাপিতার সম্মুখে শিশুর মত বসিয়া আছি। উৎসাহে ও উল্লাসে বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর হইতে শাহ্‌বাগে আসা-যাওয়া আরম্ভ করিলাম। একদিন স্ত্রীকে বলিলাম তুমি কিছু দ্রব্যাদি নিয়া মাকে দেখিয়া আস! মা তখন নাকচাবি ব্যবহার করিতেন। পাঁচ সাত দিন পরে একটি হীরার নাকচাবি, একখানি ছোট রূপার থালা, সরের দই, পুষ্পাদি সহ উপচারগুলি নিয়া স্ত্রী শ্রীশ্রীমাতাজীর শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। পরে জানা গেল, যে মাতাজী যখন কয়েকমাস ধরিয়া কেবল মাটির উপর খাদ্যাদি রাখিয়া আহার করিতেন, তখন পিতাজী বিরক্তি সহকারে বলিয়াছিলেন,—"তুমি পিতলের থালায় খাবে না, কাঁসের থালায় খাবে না, তবে কি তুমি রূপোর থালায় খাবে?" মা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"আমি রূপোর থালাতেই খাব, কিন্তু তুমি তিন মাসের ভিতর কাহাকেও এ সম্বন্ধে বলিতে পারিবে না এবং তুমি নিজেও রূপোর থালার কোন বন্দোবস্ত করিবে না।" বস্তুতঃ তিনমাস যাইতে না যাইতেই উক্ত রূপোর বাসন মায়ের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল।

একদিন মাতাজী আমাকে বলিলেন,—"সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত ভগবদ্‌ভাবরূপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রে এই শরীরের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রহি-

য়াছে—"। সেইদিন হইতে সর্ব্বতোভাবে আমি আপনাকে সদাচারে সুসংযত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

অনেকের মুখে শুনিতাম যে তাঁহারা স্বপ্নে বা প্রত্যক্ষে মাতাজীর নানা অলৌকিক মূর্ত্তির দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। মাতাজীর সাধারণ মূর্ত্তিতেই মহতী শক্তির অভূতপূর্ব্ব বিকাশ আমার চোখে প্রতিভাত হইত বলিয়া অসাধারণ কিছু দেখিবার জন্য আমার বড় উৎকণ্ঠা জাগিত না। মনে হইত, যদি তাঁহার ব্যবহারিক ধৈর্য্য ও শমতার আদর্শে জীবনকে গঠিত করিতে পারি ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু জড়ত্বের সংস্কার আমাকে বিতাড়িত করিয়া ছুটাইয়া নিয়া বেড়ায়। তাই মাতাজীকে একদা একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা সত্য সত্যই আপনি কি—বলুন।" মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ছেলে মানুষের মত এ প্রশ্ন কোথা হইতে উঠিল? জীবের সংস্কার অনুরূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন হয়। আমি আগেও যা, এখনও তা', পরেও তা'। তোমরা যখন যে যা' বলো, যে যা' ভাবো আমি তাহাই। তবে ইহা খাঁটি যে, **এই শরীরের জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয় নাই।** তোমরা মনে করনা কেন এ শরীর একটি ভাবের পুতুল; তোমরা চাহিয়াছ, তাই পাইয়াছ, এখন ইহাকে নিয়া সাময়িক খেলা করিয়া যাও। আর বেশী জানিয়া কি হইবে?" আমি বলিলাম—"মা এক থায় তো তৃপ্তি হইল না। ইহা শুনিয়াই—"আর কি জানিতে চাও বল, বল,"—বলিতেই তাঁহার চোখে

মুখে এক অমানুষিক ভাব দেখা দিল। আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে চুপ হইয়া গেলাম।

দিন পনরো পরে অতি প্রত্যূষে শাহ্‌বাগে গিয়া দেখি মার শয়ন ঘরের দুয়ার বন্ধ। দরজার সোজাসুজি সম্মুখে প্রায় ৫০।৬০ হাত দূরে একা বসিয়া আছি, হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। তখন দেখি কি নব সূর্য্যবরণা, অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিতা এক দ্বিভূজা সৌম্যা দেবীমূর্ত্তি গৃহাভ্যন্তর আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! চোখের পলক না পড়িতেই ঠিক আবার ঐ স্থানেই মাকে দেখিলাম, বোধ হইল উক্ত দেবী প্রতিমাটি তিনি নিজ দেহেই সংহরণ করিলেন।

নিমেষে এ যেন এক যাদুকরের খেলা হইয়া গেল। আমি যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তখনই মনে হইল যে আমার সেদিনকার জিজ্ঞাসা উপলক্ষ্য করিয়া মাতাজী আজ জানাইয়া দিলেন,—"দেখ, আমি কে!" আমি একটি স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যে এই শুভ-মুহূর্ত্তে আমি যেন সন্তানের মতো জননীর আশীর্ব্বাদ ও কৃপালাভে ধন্য হইতে পারি। কিছুক্ষণ পরে মা ঢুলু-ঢুলু ভাবে আমার দিকে আসিতে আসিতে মাঠ হইতে একটি ফুল ও কয়েকগাছি দুর্ব্বা হাতে নিলেন এবং আমি নমস্কার করিতেই আমার মাথার উপর সেগুলি রাখিলেন।

আমি আত্মহারা হইয়া শ্রীপাদপঙ্কজে সাশ্রুনয়নে লুটাইয়া

পড়িলাম। যে দিন যায়, সে দিন আর আসে না; কিন্তু খুবই আগ্রহ হয় যে আবার আসুক।

তখন হইতে আমার চিত্তে বসিয়া গেল যে **ইনি শুধু আমার মা নন, ইনি জগতের মা**। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। মন একটু একাগ্র হইতেই চোখে ভাসিয়া উঠে জননীর মুখচ্ছবি—আর দর দর করিয়া অশ্রুপাত হয়। সেদিনকার ভাবস্পন্দন আমার ভিতর এমন স্বাভাবিকরূপে সাড়া দিল যে তিনি তাঁহার মানুষী অবয়বে আমার অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নিত্যধ্যেয়া চতুর্ভুজা ইষ্টমূর্ত্তির স্থান অনায়াসে অধিকার করিয়া বসিলেন। এরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য উপাসনার সময়ে পূর্ব্বসংস্কারের প্রাবল্যে কখনো কখনো ভীত হইতাম—কী করিতেছি! কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত মনপ্রাণ জুড়িয়া মা আমার চিদাকাশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতা হইলেন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (কৌলিক নাম শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী) ১৮১৮ শকাব্দে (সন ১৩০৩ ইং ১৮৯৬) ১৯শে বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল) বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩ দণ্ড অবশেষ থাকিতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামে মর্ত্ত্যদেহে অবতীর্ণা হন। শ্রীশ্রীমা যে স্থানটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে (১৭ই মে ১৯৩৭ ইংরাজী) মাতাজী খেওড়া পদার্পণ করিলে ভক্তবৃন্দের আবদারে যে জায়গায় তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন নিজেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পিতা

শ্রীশ্রীমাতাজীর জন্মপত্রী এই :—

খেওড়া ও সুলতানপুরেই মার শৈশবের অল্পবিস্তর লীলাখেলা অপ্রকাশ্য ভাবে চলে। বিবাহের পর কিছুকাল

শ্রীযুত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য সেই জিলার বিদ্যাকূট গ্রামের খ্যাতনামা কাশ্যপবংশের সন্তান। তিনি তাঁহার প্রথম জীবন মাতুলালয় খেওড়া গ্রামেই অতিবাহিত করেন। শ্রীশ্রীমাতাজীর পিতা ও মাতা শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী উভয়েরই প্রকৃতি অতিশয় মধুর। তাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার এবং সরলতার আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতাজীর মাতুলবংশও অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত। এই পরিবারে কেহ কেহ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন এবং এক ধর্ম্মশীলা বধূ আনন্দে হরিনাম করিতে

ভাসুরের কর্ম্মস্থল শ্রীপুর ও নরুন্দি এবং শ্বশুরালয় আটপাড়া গ্রামে অবস্থান করেন। পরে ঢাকায় আসা পর্য্যন্ত পিত্রালয় বিদ্যাকূটে প্রায় তিন বৎসর, এবং পিতাজীর কর্ম্মস্থল বাজিতপুরে প্রায় ৫।৬ বৎসর অতিবাহিত করেন। তৎপর ঢাকা আসেন।

অষ্টগ্রামেই কীর্ত্তনের ভাব বিশেষরূপে প্রথম প্রকাশ পায়। বাজিতপুরেও সময় সময় সেই ভাব দেখা যাইত। বাজিতপুরে মন্ত্র ও যোগজ ক্রিয়াদির স্বাভাবিক স্ফুরণ হয়। তৎপর শাহ্‌বাগে আসিলে মৌনাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনে এক মহান শান্তভাবের স্ফুরণ দেখা যায়। ইহার বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কত অধ্যাত্মজগতের বাণী ও দৈবীভাবের খেলা এই সময় প্রকটিত হইয়াছে।

এই সময় বহু ভক্তের সমাগম হইতে থাকে। সকলেই এই সময়ে পূজা, কীর্ত্তন ও যজ্ঞাদিতে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এই সময়ে ভক্তদের প্রাণে কত শান্তভাবের বিনিময় হইয়াছে বলা যায় না। এই সময়ে সকলেই মাকে

করিতে মৃত ভর্ত্তার সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। মাতাজীর পিতার মাতুলবংশেও একজন সহমৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরস্থ আটপাড়া গ্রামের শ্রীযুত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তীর সহিত বার বৎসর দশমাস বয়সে মাতাজীর বিবাহ হয়। তিনি সেই গ্রামের প্রসিদ্ধ ভরদ্বাজ বংশজ। পরের মঙ্গলকামনাই তাঁহার ব্রত। তিনি ভোলানাথ এবং পশ্চিম দেশে রমা-পাগলা নামে পরিচিত।

"শাহ্‌বাগের মা" বলিতেন এবং আবেগ করিয়া বলিতেন 'এমন মায়ের ঐশ্বর্য্য আর দেখিব না।

বাজিতপুরে থাকা কালীন ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর ইতিবৃত্ত মার চোখে ভাসিয়া উঠে। ঢাকায় আসিয়া মা বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বরী আসনের পুনরুদ্ধার করেন।

সে সময় শ্রীযুত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, বর্ত্তমান অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ঢাকায় ছিলেন। তিনি ও শ্রীযুক্ত বাউলচন্দ্র বসাক ঐ স্থানটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

প্রথমদিনের সাক্ষাতে মা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,—**ক্ষুধা চাই**। কিন্তু বিষয়বাসনায় উদ্বেলিত জীবের সে ক্ষুধা হওয়া বড়ই কঠিন, যতদিন না প্রাণের উত্তাল সংসার-তরঙ্গগুলি তাঁহার চরণ তলে যাইয়া অবসিত হয়। তাই সর্ব্বদা মনে মনে প্রার্থনা করিতাম, 'মা, ক্ষুধারূপিণী তো তুমি আপনিই, ক্ষুধা দাও'। কিরূপে মা নানা লীলারহস্যের ভিতর দিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার চঞ্চল লক্ষ্য তাঁহার বিরাট সত্ত্বার অভিমুখে ধাবিত করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতেছি।

১। একরাত্রে আমি আমার বাড়ীতে খোলা বারান্দায় পায়চারি করিতেছি, জ্যোৎস্নার প্লাবনে সারা জগত ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, মুখ ফিরাইতেই দেখি, মা আমার পাশে পাশে ছায়ামূর্ত্তির মত চলিতেছেন। তাঁর পরনে একটি লাল সেমিজ

ও লাল চুড়ী পা'ড়ের শাড়ী। আমি কিন্তু কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বেই আশ্রমে দেখিয়া আসিয়াছি যে মা সাদা সেমিজ ও লাল ফিতা পা'ড়ের শাড়ী পরিয়া বেড়াইতেছেন। পরের দিন সকালবেলা মার কাছে গিয়া ঐরূপ সাড়ী ও সেমিজ উভয়ই দেখিলাম এবং জানিলাম যে আমি চলিয়া আসার পর গতকল্য সন্ধ্যায় কে একজন আসিয়া তাঁকে ঐ পোষাক পরাইয়া দিয়াছিল।

মা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি দেখতে গিয়াছিলাম তুই কি করছিস্।"

(২) একদিন মা আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন; দোতলায় বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে। এমন সময় মাকে অন্য বাড়ীতে নিবার জন্য এক মোটর আসিয়া হাজির হইল। পূর্ব্বেই সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল, আমি তা' জানিতাম না। মা যাইতে উদ্যতা হইলেন; আমার খুবই কষ্ট বোধ হইতেছিল। বুকভরা দুঃখ নিয়া তাঁহাকে মোটরে তুলিয়া দিতে নীচে নামিয়া আসিলাম। মা মোটরে উঠিলেন, গাড়ী কিন্তু চলে না। মা আমার দিকে তাকাইতেছেন আর হাসিতেছেন। অনেক চেষ্টাতেও মোটর নড়িতেছে না দেখিয়া একটি ভারাটে ঘোড়ার গাড়ী আনা হইল। ইহা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতে লাগিল যে মোটর থাকিতে মা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবেন—এ কি রকম হইল? এমনি সময় মোটর আওয়াজ দিয়া উঠিল। মা মোটরে চলিয়া গেলেন।

(৩) শাহ্‌বাগে ক্রমশঃ লোকের খুব ভিড় হইতে লাগিল। একবার ৪ দিন পর্য্যন্ত তথায় গিয়া মার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলাম না। পঞ্চম দিন প্রাতে যাইব মনে করিয়াও, কি রকম দুঃখ বোধ হইতে লাগিল, আর গেলাম না; হতাশ মনে বসিয়া আছি। দেখি কি বায়স্কোপের ছবির মত মার মূর্ত্তি দেওয়ালের গায়ে ভাসিয়া উঠিল। তাঁর মুখখানি বড় বিমর্ষ! পিছন ফিরিতেই দেখি শ্রীমান্ অমূল্য-রতন চৌধুরী চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বলিল,—"আপনাকে নিয়া যাইবার জন্য মাতাজী গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।" শাহ্‌বাগে যাইতেই মা বলিলেন,—"তোর অস্থিরতা আমি এই কয়দিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। অস্থিরতা না এ'লে স্থিরতা আসে না। ঘৃতে পারো, চন্দন-কাঠে পারো, এমন কি, খড়কুটা দিয়া হইলেও যে কোনরূপে আগুন জ্বালানো দরকার, আগুন একবার জ্বলিয়া উঠিলে আর ভাবনা নেই। সব ক্ষয় করিয়া দিবেই দিবে। দেখিস্ না এক টুকুরা আগুনের কণা কত যত্নের তৈয়ারি বড় বড় ঘর বাড়ী নিমেষে ভস্ম করিয়া দেয়।

(৪) মধ্যরজনীতে বাড়ীতে অথবা দ্বিপ্রহরে আফিসে বসিয়া আছি। দেখি কি অপ্রত্যাশিত ভাবে মার দর্শনের জন্য হৃদয়ভেদী অস্থিরতা জাগিয়া উঠিল! অনেক দিন মা সে সময় সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন,—"তুই ডাকিয়াছিলি তাই আসিয়াছি।"

(৫) একদিন বিকালে আফিস হইতে আসিয়া শুনি যে বেলা ১২টার সময় একজন লোক একটি বড় মাছ আমার বাড়ীতে রাখিয়া আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। তার পর আর তাহার দেখা নাই। মাছটি পড়িয়া আছে। যখন কাহাকেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখা গেল না, তখন মাছটি কুটিয়া শাহ্‌বাগে পাঠানো হইল। পরদিন প্রাতে আমি শাহ্‌বাগ যাইতেই পিতাজী বলিলেন, "তোমার মা কাল রাত্রে হাসিতে হাসিতে বলেন,—"দেখ, জ্যোতিশ তো আমার ভগবান।" কাল সকালে এখানে কয়েকজন ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিল; বিকালে যাহারা কীর্ত্তনে আসিল, এ খবর পাইয়া তাহারাও প্রসাদের জন্য আবদার করিতে লাগিল। ঘরে তেমন কিছুই ছিলনা, কিন্তু তোমার মা মশলাদি ঠিক করিয়া রাখিলেন। এমন সময় তোমাদের বাড়ী হইতে খগা মাছ নিয়া আসিল। তাই তোমার মা ঐরূপ বলিয়াছেন।" আমি তো অবাক; কোথা হইতে কে মাছ আনিয়া বাড়ীতে ফেলিয়া গেল, আর উহা শাহ্‌বাগে ভক্তদের পরিতৃপ্ত করিল।

এইরূপ আরো বহু ঘটনা হইয়াছে। শাহ্‌বাগে হয়ত কেহ আসিয়া মার কাছে প্রসাদ চাই বলিয়া বসিয়া আছে। দেবার মতো কোন দ্রব্য নাই। এ দিকে আমার বাড়ীতে ঠিক সে সময় মিষ্টি বা ফলাদি কিছু পাঠাইবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। লোক তাহা শাহ্‌বাগে নিয়া

গিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে মা যেন উহার জন্যই প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন।

(৬) একদিন রাত্রে তিনটার সময় আমার নিজের ঘরে বসিয়া দেখিতেছিলাম মা শয্যায় যে দিকে শিয়র দিয়া শুইতেন, ঠিক তার বিপরীত দিকে তাঁহার শিয়র রহিয়াছে। সকালবেলা গিয়া মাকে সেই ভাবেই দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম মা শেষরাতে বাহিরে গিয়াছিলেন সে অবধি এ শিয়রেই আছেন।

আমি আমার ঘর বা আফিসে বসিয়া দেখিতে পাইতাম মা কোথায় কখন কি অবস্থায় আছেন, ইচ্ছা করিলেই যে এরূপ হইত তা' নয়। আপনা হইতেই কোন কোন সময় চোখের উপর ঐ সব চিত্র ভাসিয়া উঠিত। ভূপেন তখন শাহ্‌বাগে প্রত্যহ যাইত, তাহাকে দিয়া আমার দর্শনের সত্যতা প্রমাণ করিতাম। কদাচিৎ সামান্য পার্থক্য হইত। মা বলিতেন,—"তোর ঘরতো শাহ্‌বাগে, বাড়ীতে তো বেড়াতে যাস্ মাত্র।"

(৭) একদিন বেলা ১২টার সময় আফিসে কাজ করিতেছি। ভূপেন আসিয়া বলিল,—"মা, আপনাকে শাহ্‌বাগে যাইতে বলিয়াছেন; আজ যে বড় সাহেব ছুটী হইতে ফিরিয়া চার্জ্জ নিবেন সে কথা আমি মাকে জানাইয়াছিলাম।" মা বলিলেন,—"যার কথা তাকে গিয়ে বলো, সে যা করে করুক।" বিনা কোন দ্বিধায় কাগজ পত্র

টেবিলের উপর যেমন ছিল তেমন ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া কাহাকেও না জানাইয়া শাহ্‌বাগে আসিলাম। মা বলিলেন, "সিদ্ধেশ্বরী আসনে চল"। পিতাজী, মা ও আমি তথায় গেলাম। যে জায়গায় এখন স্তম্ভ ও শিবলিঙ্গ, সেখানে একটি কুণ্ড ছিল, তাহার ভিতর মা বসিলেন। খুব হাসি হাসি ভাব আর আনন্দময়ী মূর্ত্তি। পিতাজীকে আমি হঠাৎ বলিলাম,—"মাকে আমরা **শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী** বলিব। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা তাই হবে।" মা আমার মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

প্রায় ৫॥ টার সময় আমরা ফিরিতেছি, মা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতক্ষণ তোর আনন্দ ছিল, এখন দেখি মুখের চেহারা বদলাইয়া গেছে।" আমি বলিলাম "বাড়ীমুখী হতেই আফিসের কথা মনে উঠেছে।" মা বলিলেন,—"কোন চিন্তা নাই।" পরদিন আফিসে গেলে বড়সাহেব উক্তদিনের কোন কথাই তুলিলেন না।

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এ অবস্থায় কেন ডাকিয়া নিয়াছিলেন?" মা বলিয়াছিলেন, "দেখ্‌লাম এ কয়মাসে তোর কি পর্য্যন্ত হ'ল।" আর সিদ্ধেশ্বরী না গেলে এই শরীরের নামকরণ ও বা কি ক'রে হতো।" এ বলিয়া খুব হাসিলেন।

(৮) একবার গবর্ণর ঢাকায় এসেছেন। বড় সাহেব আমায় বললেন,—"কাল দশটার সময় গবর্ণরের সাথে আমার

দেখা করার কথা। আফিস হ'য়ে যাব, তুমি ৯॥ টার সময় আসতে পার কি?" আমি বললাম—"বেশ"। আমি তার পরদিন ভোরে শাহ্‌বাগ গিয়া বাড়ী ফিরিতে দেরী হ'ল এবং আফিসে পৌঁছাতে ৯ টা ৫০ মিনিট হ'য়ে গেল। মনে মনে ভাবছি সাহেবকে কি বলব। এমন সময় সাহেব বাড়ী হ'তে ফোন্ ক'রে বললেন,—"আমার মোটর খারাপ হয়ে গেছে, তোমাকে মিছামিছি কষ্ট দিয়েছি, তজ্জন্য আমি দুঃখিত; আমি ১১ টার সময় লাট সাহেবের বাড়ী যাব!"

মা শুনে বললেন,—এ আর নূতন কথা কি? তুই তো আমার মোটরই সেদিন বিগড়াইয়া দিয়াছিলি।"

(৯) একদিন মা আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম,—"মা, আপনার তো ঠাণ্ডা গরম ভেদাভেদ নাই। একটি জ্বলন্ত কয়লা যদি আপনার পায়ের উপর পড়ে, আপনার কি কষ্টবোধ হবে না?" মা বলিলেন, "দিয়ে দেখনা কেন?" আমি আর কথা বাড়ালাম না। কয়েকদিন পরে মা সেকথার সূত্র ধরিয়া একটি জ্বলন্ত কয়লা পায়ের উপর নিজেই রাখিয়া দিলেন। দগ্ধ স্থানে ঘা দেখা দিল। প্রায় একমাস যায় ঘা শুকায় না। আমার নিজের মূর্খতার জন্য মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। একদিন মার কাছে গিয়া দেখি তিনি পাদু'খানি লম্বা করিয়া টানিয়া বারান্দায় একদৃষ্টিতে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি

প্রণাম করিয়াই সেই ক্ষতস্থানের পুঁয চুষিয়া লইলাম। তার পর দিন হইতে ঘায়ের অবস্থা ভাল দেখা গেল!

এ প্রসঙ্গে পরে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি,—"যখন অঙ্গারটি; মাংসের উপর বসিয়া যাইতেছিল, কেমন লাগিয়াছিল?" মা বলিলেন,—"লাগালাগি কিছুই বলিতে পারিনা। এতো খেলা ছাড়া কিছুই নয়। অঙ্গারটি কি করিতেছে মহানন্দে তাই দেখিতেছিলাম। প্রথমে দেখিলাম লোমগুলি পুড়িয়া গেল, চামড়া খুঁড়িতে লাগিল, গন্ধ বাহির হইল। পরে জ্বলন্ত কয়লাটি তার কাজ করিয়া নিভিয়া গেল। যখন ঘা হইল, উহা উহার ভাবেই ছিল, যেই তোর তীব্র ইচ্ছা হইল,—ঘা শীঘ্র সারিয়া উঠুক,—তখনই ক্ষত শুকাইতে লাগিল।"

(১০) মাঘ মাস, ভয়ঙ্কর শীত। মার সহিত প্রত্যূষে খালিপায়ে রমনার ভিজামাঠে বেড়াইতেছি। দূর হইতে দেখি কি একদল মেয়ে আসিতেছেন। আমার মনে হইল, ইহারা আসিলেই তো মাকে আশ্রমে নিয়া যাইবেন। এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি কি সমস্ত মাঠ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দর্শনার্থিনীদের আর দেখা গেল না! ২।৩ ঘণ্টা পরে আশ্রমে আমরা যখন ফিরিলাম, শোনা গেল মাঠে তাঁহারা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রান হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। মাঠটি খুবই বড়। এই কথা মাকে জানাইলে তিনি বলিলেন, "তোর তীব্র ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে।"

(১১) একবার মার খুব সর্দ্দি ও কাসি হইয়াছে। আমি দেখিয়া কাতর ভাবে বলিলাম, "মা শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠুন।" মা মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কাল হ'তে ভাল হব।" তাই হইয়াছিল।

(১২) একদিন সকালে গিয়া দেখি মার জ্বর। আমি সে রাত্রিতে ঘরে বসিয়া খুব একান্ত মনে মার নিকট প্রার্থনা জানাইলাম যে মার অসুখটি আমার ভিতর আসুক। দেখি কি শেষরাত্রে আমার জ্বর ও মাথাধরা হইল। সকালে মার কাছে যাইতে না, যাইতেই মা বলিলেন—"আমি তো ভাল হয়ে গেছি, তোর তো জ্বর হইয়াছে। আজ গিয়া স্নান করিয়া বেশ খাওয়া দাওয়া কর্।" আমি তাহাই করিলাম, বিকাল হইতে শরীর ভাল হইয়া গেল।

মা বলেন, "শুদ্ধ অনন্য ভাবের জোরে সবই সম্ভব হয়।"

(১৩) আমার হাতে "সাধুজীবনী" নামে একটি বই আসিয়াছিল। তাহাতে একস্থানে এই উক্তি ছিল— "দরিদ্রকে অন্নদান করিবার জন্য তিনি তাঁহার ভক্তগণকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন।" এই উক্তির পার্শ্বে আমি একটু নোট লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—'কেবল অন্নদানে তৃপ্তি সাধন হয় না।' এই বইখানি ঘটনাক্রমে শাহ্‌বাগ যায় এবং কোন ভক্ত আমার মন্তব্যটি মাকে পড়িয়া শোনায়। ইহার কয়েক-দিন পরে আমি ভোরে শাহ্‌বাগে গিয়াছি। একটি লোক পাগলের মত আসিয়া মাকে বলে,—"আমাকে কিছু খাবার

দাও, না হ'লে আমার প্রাণ আর বাঁচে না।" ইহা শুনিয়াই রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর খুঁজিয়া মা যাহা পাইলেন, তাহাকে দিলেন। লোকটি জল চাহিলে, মা আমাকে বলিলেন— "ইহাকে জল দাও।" জল দিতে গেলে জানিতে পরিলাম যে লোকটি মুসলমান। তিন দিন পর্য্যন্ত সে খাইতে পায় নাই। সেদিন ক্ষুধা তৃষ্ণার অসহনীয় জ্বালায় বাগানের দেওয়াল টপ্‌কাইয়া ভিতরে আসিয়াছে। মা আমাকে বলিলেন,—"দেখ্‌লি অজ্ঞানেরও আবশ্যক। এই লোকটি তোর ভুল ভাঙ্গিবার জন্যই এখানে এসেছিল! পাত্র ও সময়োপযোগী সবই দরকার। এ জগতে কিছুই বৃথা যায় না।"

(১৪) একদিন আমি মাকে বলিলাম,—"মা আমার আজকাল খুব নাম চলিতেছে।" তখন সময় সময় গভীর রাত্রে আপনা হইতে ফোয়ারার মত নাম উদ্‌গত হইত। মার সহিত ঐ আলাপের পশ্চাতে আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ অহঙ্কারও ছিল। মা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিশেষ কিছু আর বলিলেন না। বাসায় ফিরিলে দেখি চেষ্টা করিলেও নাম আসে না। দিন গেল, রাত্রি গেল, নামের প্রবাহ যেন স্বতঃই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পরদিন প্রাতে ভূপেনকে বলিলাম,—"মাকে এ বিষয়ে জানাও"। ভূপেন যাইবার পথে মাকে গাড়ীতে পাইয়া আমার দুর্দ্দশার কথা বলিল। মা খুব হাসিতে লাগিলেন। তখন বেলা

দশটা। এদিকে ঠিক সে সময় আমার ভিতর নাম আপনা হইতেই উৎসারিত হইতে লাগিল। পরে শুনিলাম ভূপেনের সহিত মার কখন সাক্ষাৎ হয়।

এ প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন যে ধর্ম্মপথে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের ছায়াও লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

(১৫) শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাব কিরূপে অদৃশ্যভাবে আমাদের হৃদয়ে অচিরাৎ ক্রিয়া করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা সে কৃপা ধরিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা করি না, তাই যেমন ছিলাম আবার তেমন হইয়া পড়ি। হাসিতে হাসিতে মা একদিন বলিলেন—"নাম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয়ে ভাবশুদ্ধি হইলে অনেক রকম উচ্চ উচ্চ অবস্থার আভাস প্রাণে জাগে, কাজ করে।" যেদিন এ বাণী কাণে পৌঁছিল, সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ীতে একান্তে বসিলে দেখিলাম নামে অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ হইতেছে। নাম যেন স্বতঃই অবিরাম একধারায় চলিতেছে, রাত্রে ঘুমের ভাব আসিল, ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি নামের গতি পূর্ব্বের মত একটানা চলিয়াছে। দ্বিতীয় দিনের কর্ম্মঝঞ্ঝাটেও এই ভাবের প্রবাহ কম বেশী ছিল; কিন্তু সন্ধ্যায় যেই আপন ভাবে বসিলাম, পূর্ব্বদিনের মত আনন্দ জাগিয়া উঠিল, রাত্রে আর নিদ্রার ভাবই আসিল না। মধ্যরাত্রে কতক্ষণ এরূপ বোধ হইতেছিল যে নাম বন্ধ না হইলে যেন আমি স্বস্তি পাই না। আমি পূর্ব্বে কোনদিন

গোমুখী আসন করি নাই, শেষরাত্রে আপনা হইতেই অনুরূপ আসনে বসিয়া গেলাম। সে সময় শরীর ও মন কি এক অব্যক্ত আনন্দে ডুবিয়া গেল। অবিরল ধারে চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। আমি অচল, অটল হইয়া এক ধ্যানে বহুসময় কাটাইয়া দিলাম।

মা শুনিয়া বলিলেন—"এতো এক ফোঁটা ঝরা মধুর আস্বাদ পাইলি, বুঝে দেখ্ এখন মৌচাকে কত মিষ্টি।"

(১৬) মায়ের চরণে শরণাগতির প্রথমাবস্থায় একদিন সকালে চুপ্ করিয়া বসিয়া আছি। প্রাণে গভীর উচ্ছ্বাস; কাঁদিতে কাঁদিতে নিম্নলিখিত গানটি ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল,—

তোমারি সাধনা, তোমারি বন্দনা
হউক আমার জীবন সম্বল।
তোমারি স্তবে তোমারি ভাবে
হউক আমারি পরাণ উছল॥
আমি আকাশেরি পানে
তোমারি সন্ধানে অনিমেষে চেয়ে রব।
আমি চাহিব না কিছু ক'ব না কথাটি
কেবল চরণে লুটাব নিয়ে আঁখিজল॥
আমি তোমারি অসীমে ঘুরিব ফিরিব,
তোমারি মহিমা গানে।

আমি তোমারি আনন্দে রব সদানন্দে
তুলিয়া তোমার নামের হিল্লোল ॥
আমার সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম
তোমারি পূজার লাগি।
মাগো! দাও শুদ্ধাভক্তি, বিশ্বাস অটল
রাতুল চরণ করিতে সম্বল ॥

"পাগলের গান" এই গানটির নামকরণ করিয়া একখানি প্রতিলিপি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে পাঠাইয়া দিলাম। শুনিলাম মা তখন বঁটি দা নিয়া লাউ কুটিতেছিলেন। গানের পদগুলি শুনিতে শুনিতে তাঁহার হাত হইতে লাউ পড়িয়া গেল, কেমন এক অপ্রাকৃত ভাবে তিনি কতক্ষণ স্থির হইয়া ছিলেন।

পরে আমার সহিত দেখা হইলে মা বলিলেন—"জগৎ ভাবময়, সৃষ্টবস্তু সকলই ভাবের মূর্ত্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই এক খেলা চলিতেছে। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়, তাই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।"

ইহার পর একদিন সিদ্ধেশ্বরী আসনে, সকলে বসিয়া আছি। মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"তোর পাগলের গানটি গা' তো।" গান গাওয়ার অভ্যাস আমার চলিয়া গিয়াছে অনেকদিন, তদুপরি সেখানে অনেক লোক। আমি দ্বিধা করিতে লাগিলাম। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পাগলের গান লিখিয়াছিস্ মাত্র এখনো পাগল

হ'তে পারিস নাই।" কথাগুলি হৃদয়ের প্রতি স্তর যেন বিদীর্ণ করিয়া দিল—আমি শশব্যস্তে গানটি সেখানে গাহিলাম।

এরূপভাবে অনেক গান মার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে এবং মার চরণে সেইগুলি নিবেদন করিতেই কোন কোন সময় তিনি অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন, কখনো বা একেবারে চুপ করিয়া রহিয়াছেন। এমনও অনেক সময় ঘটিয়াছে যে মা ঢাকায় নাই; নীরবে আমার ঘরে বসিয়া সন্ধ্যায় বা নিশীথে আপনপ্রাণে আপনভাবে গান উঠিয়াছে; আর সম্মুখে দেখিতেছি যেন শ্রীশ্রীমা স্থির মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কোন কোন সময়ে প্রবাস হইতে ঢাকা ফিরিয়া আসিলে মা বলিয়াছেন সেদিন যে গানটি গাহিতেছিলি এখন শুনাও তো। অথচ তখনো তাঁহাকে সে গান দেখানো হয় নাই বা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই।

মায়ের জন্য তীব্র আকুলতা আমাকে অনেক সময় একমুখী স্রোতে অসীমে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। এরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া যে কয়েকটি গান রচিত হইয়াছিল, তাহা 'শ্রীচরণে' নামে পুস্তকাকারে ছাপানো হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন কত গান, কত কবিতা, কত প্রবন্ধ মার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছি, আর ছিঁড়িয়াছি ইয়ত্তা নাই। মা একদিন ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"শুধু কি এ জন্ম,

কত জন্ম ধরিয়া তুই কত কি ছিঁড়িয়াছিস্ ঠিক আছে? তবে জানিস্, এসব ছেঁড়াছেঁড়ির ভিতর দিয়াই 'এবারই তোর শেষ।"

উপরোক্ত অনন্তমুখী কৃপার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ক্ষুধার উদ্রেক হইল বটে, কিন্তু দূষিত জিহ্বা রস ও শক্তিবর্দ্ধক সুখাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, রুক্ষ ও কটু আহারের জন্য লালায়িত থাকিত। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়—

"জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

আমার অবস্থাও তাই হইল। মার অপার দয়া, অভাবনীয় স্নেহ তাঁহার চরণে আমাকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বভাবে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের নিত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কি কঠিন! মাকে একদিন বলিলাম,—"আপনার এরূপ আশ্রয় পাইলে বোধ হয় পাথর ও সোনা হইয়া যাইত কিন্তু আমার তো কিছুই হইল না।" মা বলিলেন, "যে জিনিষটা গড়িয়া উঠিতে বেশী সময় নেয়, তা খুব পাকা পোক্ত হইয়া সুন্দর হয়। তুই এত ভাবিস্ কেন?" কেবল শিশুর মত হাত ধরিয়া থাক্।" কত প্রবোধ বাক্য, কত গভীর উপদেশ পিপাসিত প্রাণে শুনিতাম, কিন্তু আবার শুষ্কতায় ছট্‌ফট্ করিতাম। আমার এ সব দুর্ব্বৃত্ততার ভিতর মার দৃষ্টি কিরূপ অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নীচে লিপি করিলাম।

মার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার দর্শনের অনুরাগে যখন

নিত্য যাতায়াত আরম্ভ করিলাম, তখন অনেকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। নানাভাবের সমালোচনা শুনিয়া মনে হইল—এদিকে ওদিকে সর্ব্বদা ছুটাছুটি করা চিত্তের দুর্ব্বলতা বই নয়'।

যোগবাশিষ্ঠ পাঠে বিচারের পথে অগ্রসর হইব এই সঙ্কল্প করিয়া ৭।৮ দিন তাহাতে মন দিলাম। এক দুপুরে বাড়ীতে আছি, খগা আসিয়া খবর দিল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (বিক্রমপুর গাওদিয়ার শ্রীযুক্ত কালীকুমার মুখোপাধ্যায়) পাঁচ মিনিটের জন্য আমার সাক্ষাৎ চায়। তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিলেন,—"আমি ৺নিরঞ্জন বাবুর ও শশাঙ্ক বাবুর (পূজ্যাস্পদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী) বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে না পাইয়া আপনাকে ত্যক্ত করিতে আসিয়াছি। শুনিয়াছি আপনি মা আনন্দময়ীর ভক্ত। মা কি রকম, তাঁর বিশেষত্ব কি ?" এই প্রশ্ন শুনিতে শুনিতেই আমার দুইচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। আমি নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আমার জবাব পাইয়াছি, এখন বলুন ত আপনি কেন কাঁদিতেছেন ?" আমি বলিলাম, "এ কয়দিন মার চিন্তা ছাড়িয়া, আমি অন্য বিষয় লইয়া আছি ; আর আপনি আমার নিকটই মার খোঁজ করিতে আসিয়াছেন, আমি লজ্জায় ও দুঃখে মরমে মরিয়া যাইতেছি। মাঁর কি বিচিত্র লীলা আপনি ঠিক সময় আসিয়া আমাকে আমার গন্তব্য পথে ফিরাইয়া আনিলেন। আপনার নিকট তজ্জন্য চিরঋণী

রহিলাম।" তিনি বলিলেন "আমাকে এখনই মার নিকট লইয়া চলুন।" মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি মাতৃহারা হইয়াছি বহুদিন, কিন্তু মাকে দেখা মাত্রই আমার সে অভাব যেন সম্পূর্ণ ঘুচিয়া গেল।"

উক্ত ঘটনা মাকে জানাইয়া মার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া আমি কাঁদি আর মা হাসেন। পরে বলিলেন "আজ কালকার দিনে চোখে আঙুল দিয়া না দেখাইলে চলে না।"

মন্ত্র বিভূতি

যতদূর জানা গিয়াছে শ্রীশ্রীমায়ের লোকাচার অনুযায়ী কোনো দীক্ষা বা গুরুলাভ হয় নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ বা আলোচনার সাহায্যে তাঁহার জ্ঞানভূমির উজ্জ্বলতা সাধিত হয় নাই। অনেকেই মনে করেন তিনি ভাগবতী ঐশ্বর্য্য লইয়া বর্ত্তমান যুগের জীবের কল্যাণের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

বাল্যকালে শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে নানা অদ্ভুত ভাবের বিকাশ হইত। তবে তাহা সাধারণ লোকের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। তাঁহার শৈশবের ধূলা-খেলার মধ্যে এমন উদাস, অনাসক্ত ভাব দেখা যাইত যে অনেকেই তাঁহাকে "বোকা", "হাবা" মেয়ে বলিয়া মনে করিত। এমন কি শ্রীশ্রীমায়ের জনকজননীও তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আশঙ্কায় মুহ্যমান ছিলেন। কোন কোন সময় এরূপ হইত যে

কোথায় আছেন বা নাই কিংবা পূর্ব্বক্ষণে কি করিলেন বা বলিলেন তাহাতে একেবারে তাঁহার খেয়াল থাকিত না।

শুনা গিয়াছে তিনি চলিতে চলিতে গাছপালা বা অপ্রত্যক্ষ অশরীরী মূর্ত্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং নানা আকার ইঙ্গিতের দ্বারা নানা ভাবাদি প্রকাশ করিতেন; কখনো বা উন্মনস্ক হইয়া হঠাৎ থমকিয়া চুপ হইয়া যাইতেন।

তাঁর শরীরে ১৭৷১৮ বৎসর হইতে প্রায় ২৪৷২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিবিধ অলৌকিক ভাবাদির বিশেষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। কখনো কখনো দেবদেবীর নাম করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়িতেন; কীর্ত্তনাদির প্রভাবেও শরীর অসাড় হইয়া যাইত; ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনিলে বা দেব মন্দির দর্শনাদিতে শরীর ব্যবহারিক জগতের কর্ম্মধারায় চলিত না। শ্রীশ্রীমা প্রায় ১৮ বৎসর বয়সে বাজিতপুর (মৈমনসিং) গিয়া ৫৷৬ বছর ছিলেন। ঐ সময়ের শেষ ভাগে তাঁহার শরীর হইতে মন্ত্রাদি স্বতঃস্ফুরিত হইয়াছিল, দেবদেবীর মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়াছিল। এবং গায়ে যৌগিক ক্রিয়াদি প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সমস্ত দৈবী প্রভাবের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কথা বন্ধ হয়, মৌনাবস্থায় বাজিতপুর ১ বৎসর ৩ মাস ও পরে ঢাকায় ১ বৎসর ৯ মাস কাটে। অবশেষে লোকদৃষ্টিতে তাহার এক নির্ম্মল প্রশান্তি বা বিরাট ভাব আসিয়া পড়ে। তখন দেখা যাইত তাঁহার শরীরের মধ্যে যেন বাহ্য ও অন্তঃক্রিয়ার স্পন্দন স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তিনি যেন স্বভাবে

স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ সময়কার একটা ছবি এখানে সন্নিবেশিত হইল।

উক্তরূপ অবস্থাদির প্রকাশের সময় পিতাজী প্রায়ই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িতেন এবং ভাবিতেন 'এ সকলের পরিণতি কি হইবে?

কিন্তু নানা লোকচর্চ্চার ভিতরও তিনি কখনো শ্রীশ্রীমায়ের কোন কার্য্যে কখনো বাধা জন্মাইতেন না। তাঁহার শরীরে দেবতার আবেশ হইয়াছে মনে করিয়া সাধু এবং ওঝার দ্বারা কয়েকবার তাহার প্রতিকার চেষ্টা করাও হইয়াছিল। তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই, বরং তাহারা শ্রীশ্রীমাতা-জীর নিকটে গিয়াই ভয়ে বিস্ময়ে সরিয়া গিয়াছিল এবং জননীর কৃপা ভিক্ষা করিয়া পরে সুস্থ হয়।

সে সময় শ্রীশ্রীমায়ের শরীরে প্রায় ৫৷৷০ মাস কাল ধরিয়া নানা দেবদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল; তিনি জীবন্ত শরীর-ধারী কত দেবদেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি তাহাদের পূজা করিতেন, পূজান্তে আবার তাহারা তাঁহার দেহমধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। বাহনাদিসহ এক দেবতার পূজা সমাপন হইলে অন্য দেবতার আবির্ভাব হইত। পূজা আরত্রিকের সময় তিনি অনুভব করিতেন তিনি নিজেই দেবতা, নিজেই পূজক, নিজেই তন্ত্রধার, তিনিই মন্ত্র, তিনিই পূজার জল, ফুল, নৈবেদ্যাদি উপকরণ।

উপরোক্ত পূজাদিতে কোনও বাহ্যিক উপচারাদি ছিল না

কিম্বা তিনি নিজের ইচ্ছাতেও ঐ সকল ক্রিয়া করেন নাই। একান্তে বসিলেই স্বাভাবিক ভাবে পূজাদির যথাযথ দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াগুলি শরীরের উপর আপনা আপনিই হইয়া যাইত। পরে ক্রিয়াবিৎ লোক হইতে জানা গিয়াছে যে মণ্ডল, যন্ত্রাদি অঙ্কন হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞাদি সকল অনুষ্ঠানই শাস্ত্রসম্মতভাবে সম্পন্ন হইত। এই বিষয়ে মাকে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে মা বলিতেন,—"আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—জানিবার সময় হইলে জানিতে পারিবে।"

২৮শে চৈত্র ১৩৩০ বঙ্গাব্দ (ইংরাজী ১৯২৩ সাল) শ্রীশ্রীমা ঢাকা পদার্পণ করিলেন এবং ৩।৪ দিন পরেই স্থানীয় শাহ্‌বাগ বাগানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বহু ভক্তের সহযোগ হইতে লাগিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক পূজাদির বিবরণ শুনিয়া কয়েকজন ভক্ত মিলিয়া মাকে কালীপূজা করিবার জন্য প্রার্থনা জানায়। মা বলিলেন—"আমি তো তোমাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের কোন খবর রাখি না, পূজার ব্যাপার পুরোহিতকে দিয়া করানোই তো ভাল।" পরে একবার পিতাজীর ইচ্ছায় মা পূজা করিবেন স্থির হইল।

সকলে যাঁকে পূজা করিয়া আনন্দ পায়, তিনিই যখন দেবতার পূজা করিতে বসেন ভক্তদের শিক্ষার জন্য, সে পূজার ঐশ্বর্য্য যে কত অপরূপ হইয়া উঠে, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

শ্রীশ্রীমা পূজা করিবেন, এ পূজা কেমনতর হইবে, এ বিষয়ে কল্পনা করিতেও ভক্তদের প্রাণে কতই না ঔৎসুক্য ও আনন্দ বোধ হইতেছিল !

যথাসময়ে মূর্ত্তি আসিল। পূজার সময় মা আসনস্থা হইয়া কিয়ৎক্ষণ মাটির উপর চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে ঢুলু ঢুলু ভাব নিয়া কলের পুতুলের মত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতে করিতে ডান ও বাম হাতে নিজের মাথার উপরে ফুল চন্দনাদি দিতে লগিলেন; কখনো কখনো কালী মূর্ত্তির গায়েও কয়েকটি দিলেন। এরূপে পূজা সম্পন্ন হইয়া গেল।

বলির ব্যবস্থা ছিল। ছাগটিকে স্নান করাইয়া মার কাছে আনিলে, তিনি সেটিকে কোলে নিলেন এবং খুব কাঁদিতে কাঁদিতে উহার শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পরে উহার প্রতি অঙ্গে মন্ত্র পাঠ করিয়া কানে কানে কি জপ করিলেন। খড়্গ উৎসর্গ করিবার সময় মাটিতে পড়িয়া নিজের গলার উপর খড়্গটি স্থাপন করিলেন। সে সময় পাঁটার ডাকের মত তিনটি ডাক তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। পরে বলি দিতে নিয়া গেলে দেখা গেল পাঁঠাটি কোন রকম চীৎকার বা ছট ফট করিল না। বলির পর উহার দেহ হইতে কোন রক্ত পড়িল না, অতি কষ্টে এক ফোঁটা রক্ত হোমের জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সে সময় মায়ের অসাধারণ কমনীয় মূর্ত্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ক্রিয়া

কর্ম্মের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অপূর্ব্ব একাগ্রতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দেও সকলে কালীপূজা করিবার জন্য শ্রীশ্রী-মায়ের নিকট প্রার্থনা জানাইল। ইতিমধ্যে মা একদিন এক ভক্তের বাড়ীতে গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন—মা হঠাৎ তাঁহার বাম হাত উঁচুতে তুলিয়া একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পিতাজী জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর দিলেন না। তিনি পরে যখন সে বাড়ীতে ভোগে বসিয়াছেন, আবার পূর্ব্বের মত অস্বাভাবিক ভাবে হাত তুলিলেন। এ বিষয়ে মা পরে বলিয়াছিলেন যে মা যখন রাস্তায় গাড়ীতে ছিলেন, তখন ১২০।১৩০ গজ দূরে মাঠের মাঝে মাটি হইতে প্রায় ১৮ হাত উঁচুতে শূন্যে চলার অবস্থায় এক সজীব কালী মূর্ত্তি মাকে দেখিয়া তাঁহার কোলে আসিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিবার মত করিয়াছিল। আবার ভোগে বসিলে, তখনো সে কালীমূর্ত্তি ছোট মেয়ের মত সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই দুই স্থানে তাঁহার বাম হাত উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছিল।

কালীপূজার একদিন পূর্ব্বে শাহ্‌বাগে পুনরায় ভক্তেরা পূজার জন্য মিনতি জানাইলে মা পিতাজীকে বলিলেন,—"এদের যখন এত আগ্রহ, তুমিও ত পূজা করিতে পার!" পিতাজী ইহা শুনিয়া সকলকে বলিলেন—"পূজার কথা তোমাদের মায়ের মুখ হইতে যখন একবার বাহির হইয়াছে

রমনা আশ্রমে কালীমূর্ত্তি, ১৯২৬ ইং

[৩২ পৃষ্ঠা

ভোলানাথ ও মা

[৩৩ পৃষ্ঠা

তখন পূজা হইবেই, তোমরা আয়োজন কর।" কালীমূর্ত্তি কি মাপের হইবে এ কথা উঠিলে পিতাজীর মনে জাগিল যে মা সেদিন গাড়ীতে ও আহারে বসিয়া হাত তুলিলে যতখানি উঁচু হইয়াছিল ততখানি উঁচু মূর্ত্তি আনা হউক। মা তখন অসাড় অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া ছিলেন। আন্দাজে একটি মাপ নেওয়া হইল। রাত্রি তখন প্রায় ১১ টা ; এক দিনের মধ্যে ঐ মাপের মূর্ত্তি কি করিয়া হয়, কোথায় পাওয়া যায়, ইত্যাদি নানা দ্বিধা নিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শাহ্‌বাগ হইতে সহরে আসিলেন। যাইতেই দেখা গেল এক দোকানে ঠিক ঐ মাপের একটিমাত্র মূর্ত্তি রহিয়াছে। সে কারিকর মোটে ১২টি মূর্ত্তি বানাইয়াছিল; ১১টির ফরমাইস্ ছিল, বাকী একটি সে নিজের ইচ্ছায় করিয়াছিল। তাহাই পড়িয়াছিল। যথাসময়ে সে মূর্ত্তি আনা হইল। পূর্ব্বেকার পূজার মত মা পূজা সম্পাদন করিলেন। সে সময় মার অপরূপ দৈবীভাব দেখা যাইতেছিল। পূজার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মা আসন হইতে উঠিয়া পিতাজীকে বলিলেন,—"আমি নিজের আসনে যাইতেছি, তুমি এখন পূজা কর"। ইহা বলিয়া তিনি নিমেষে কালীমূর্ত্তির পাশে দাঁড়াইয়া অট্টহাস্যে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন পূজার ঘরটি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবস্পন্দনে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মা বলিলেন—"তোমরা সবাই চোখ বুজিয়া নাম কর।"

গৃহ লোকে পরিপূর্ণ; বাহিরে আড়ালে থাকিয়া কে

একজন চুপি চুপি দেখিতেছিল। ইহা কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মা তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমিও চোখ বুজ।" সকলেরই নেত্র নিমীলিত; কি হইল না হইল কেহই জানিল না। চোখ খুলিলে দেখা গেল উকীল বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন,—"মার মুখমণ্ডলে এক উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন।"

পূজা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও শেষ হইয়া গেল। সেইবার আর বলির ব্যবস্থা ছিল না। পূর্ণাহুতি দিবার সময় মা কহিলেন,—"পূর্ণাহুতি দেওয়া হইবে না, যজ্ঞের অগ্নি রাখিয়া দাও।" সে অগ্নি এখনও রমনার আশ্রমে রক্ষিত হইতেছে।

পরদিন মূর্ত্তি-বিসর্জ্জনের কথা হইতেছে, ৺ নিরঞ্জনের স্ত্রী বিসর্জ্জনের দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত। তিনি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মাকে কাতরে জানাইলেন যে—"মা এ মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে আমার দুঃখ বোধ হইতেছে।" মা বলিলেন,—"তোমার মুখ দিয়া যখন এরূপ বাহির হইল, তখন এ মূর্ত্তি সম্ভবতঃ বিসর্জ্জিত হইতে চায় না। আচ্ছা, ইহা রাখিয়া পূজার ব্যবস্থা করা যাইবে।"

নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া এ মৃন্ময়ীমূর্ত্তি* প্রায় ১০ বছর ধরিয়া এখনো সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

---

* এ মূর্ত্তির একখানি ছবি এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।

১৯২৭ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মা চুনার হইতে জয়পুর যাইবেন। আমি তখন চুনারে ছিলাম। তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছি। তখন মা আমাকে ফোর্টের পাহাড়ের গায়ে একটি স্থান উল্লেখ করিয়া বলেন,—"সেখানে একটি ফুলের মালা পাইবি, ফিরিবার পথে তাহা নিয়া যত্নে রাখিয়া দিস্।" আমি উহা খুঁজিয়া নিয়া রাখিলাম। মা জয়পুর হইতে ফিরিয়া সে মালা দেখিলেন। পরে যখন মা ঢাকা গেলেন, তখন অনুসন্ধানে জানা গেল যে প্রত্যহ কালীমূর্ত্তির গলায় যে ফুলের মালা দিবার ব্যবস্থা ছিল, উক্তদিন ভুলে তাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। আর একবার মা কাক্সবাজারে ছিলেন, একদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বেড়াইবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার হাতখানা ভাঙা নাকি? ভাঙা নাকি? তোমরা দেখ, উহা ভাঙিতেও পারে।" ঠিক সে রাত্রিতে ঢাকায় কালীমূর্ত্তির হাত ভাঙিয়া চোরে গয়না অপহরণ করিয়াছিল।

এই মূর্ত্তি এখন রমনা আশ্রমে ভূগর্ভে রহিয়াছেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে মার জন্মোৎসবের সময় সকল শ্রেণীর লোকের দর্শনার্থে ইহার দ্বার খোলা হয়। ভারতে দেবমন্দিরাদির দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হউক—এই আন্দোলনের পূর্ব্বেই মার উক্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল।

একবার সিদ্ধেশ্বরী আসনে বাসন্তী পূজা হয়। মূর্ত্তিগুলির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সময় মা তথায় উপস্থিত থাকিয়া একদৃষ্টে

অনেকক্ষণ উঁহাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন। মৃন্ময়ী প্রতিমা গুলির চক্ষু তখন জীবন্ত মানুষের চক্ষুর ন্যায় দীপ্তিময় দেখাইয়াছিল।

মা বলেন—"দেবদেবীর সত্তা আমার তোমার দেহের মতো সত্য এবং ভাবের চোখে তাঁহাদের দর্শন লাভ হয়।

ভাব বিভূতি

যাঁহার প্রত্যেকটি ভাব আনন্দময়, আনন্দই যাঁহার উপাদান, আনন্দেই যিনি অবস্থিত, যিনি জগতে আনন্দ-লীলা করিবার জন্য আনন্দঘন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে জীবকল্যাণার্থে বহুভাবের উৎপত্তি; স্থিতি ও লয় হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে বোধ হয় শ্রীশ্রীমা যেন দুইরূপে বিরাজিতা—একটি বাহিরের রূপ আর একটি অন্তরের রূপ; এই দুইয়ের লীলাখেলা ওতপ্রোত ভাবে তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

ছেলেবেলা হইতেই ঢাকা আসার পর অধিকাংশ সময় মা শুইয়া থাকিতেন। আমরা শুনিতাম মা কি এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবের উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া বিভোর অবস্থায় কখনো কখনো প্রহরের* পর প্রহর পড়িয়া থাকিতেন এবং কীর্ত্তনের সময় তাঁহার লীলাদি বিশেষ-রূপে প্রকাশ পাইত।
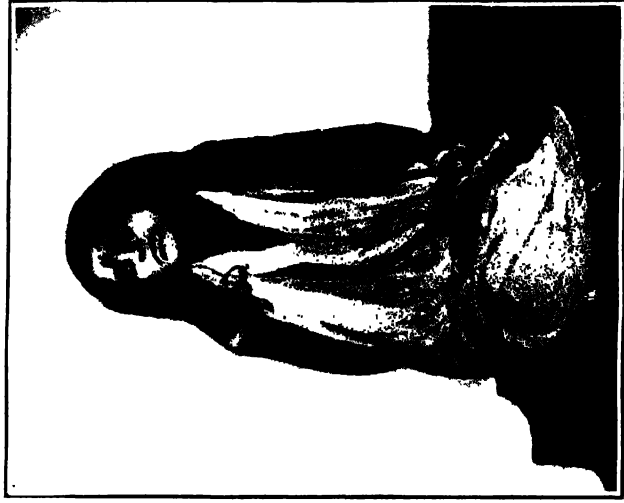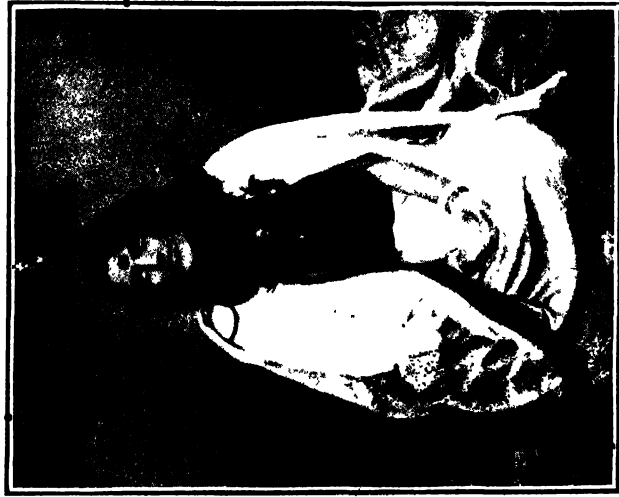
ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি

[৩৬ পৃষ্ঠা

ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম ছবি ১৯২৫.ইং [৩৬ পৃষ্ঠা

১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ ইংরাজী) শাহ্ বাগে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কীর্ত্তন হইবে। ইহাই মায়ের দরবারে প্রকাশ্যে কীর্ত্তন। সে সময় চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুত শশীভূষণ দাশগুপ্ত ঢাকা আসিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইতে না হইতেই মাকে দেখিয়া ভক্তিশ্রদ্ধায় গলিয়া গেলেন। লোকের খুব ভিড়, তিনি দূর হইতে মাকে দর্শন করিতেছেন আর অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতেছেন। তিনি আমাকে বলিলেন—"জীবনে যা দেখি নাই তা আজ দেখিলাম, বিশ্বজননীর প্রকাশমূর্ত্তি দর্শন করিলাম।" প্রায় ১০ টার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মা বসিয়া মেয়েদিগকে সিন্দুর দিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে কৌটাটি পড়িয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াইয়া শরীরটা উঠিল এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর খাড়া হইয়া দুইহাত উপর দিকে তুলিয়া ও মাথাটি একেবারে পিছনে পিঠের সঙ্গে লাগাইয়া পলক বিহীন স্থির উর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। পরে মা এরূপ অবস্থায় চলিতে লাগিলেন। কি যেন এক অলৌকিক ভাবে পরিপূর্ণ। মাথায় গায়ে বস্ত্রাদির প্রতি কোন খেয়াল নাই। তাঁহাকে কারো ধরিয়া রাখার সাধ্য ছিল না; তাঁহার শরীর নৃত্য করিতে করিতে যাইয়া কীর্ত্তনের স্থানে গিয়া পড়িয়া গেল। মাটিতে পড়িয়াই ৩০।৪০ হাত স্থানের উপর দিয়া বায়ুবেগে শুক্‌না পাতার মত গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

খানিক পরে শোয়া অবস্থায়ই মুখ হইতে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" ধ্বনি সুমধুর সুরে বাহির হইতে লাগিল; নেশার মত ঢুলু ঢুলু ভাবে শরীরটা উঠিয়া বসিল! আর দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অনেক সময়ের পর তিনি প্রকৃতিস্থা হইলেন। তখন তাঁহার অপূর্ব্ব মুখশ্রী, মধুর চাহনি, গদ গদ ভাব দেখিয়া অনেকে বলিতে-ছিলেন—"গ্রন্থাদিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার ভাবা-বেশের কথা পড়িয়াছি, তাহাই আজ শ্রীশ্রীমায়ের অঙ্গে প্রকট দেখিলাম"! আবার সন্ধ্যার সময় মা কীর্ত্তন-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; মধ্যাহ্নের মত ভাবাবেশ দেখা দিল। কীর্ত্তনীয়াদের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন, এক পায়ের উপর উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে কিছুদূরে গেলেন, পরে তাঁহার শরীর মাটির উপর পড়িয়া গেল, অনেক সময় এভাবে চলিয়া গেল, আবার মা উঠিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার আধ আধ জড়ানো কথা সমবেত ভক্তদের হৃদয় যেন অমৃতরসে পূর্ণ করিয়া তুলিল। লুটের পর মা নিজ হস্তে খিচুরী প্রসাদ বিলাইলেন, সেই সময়ে জনতার মধ্যে তাঁহার প্রসাদ বিত-রণের ক্ষিপ্রতা এবং অলৌকিক মাতৃভাবের স্ফুরণ দেখিয়া সকলেরই মনে হইতেছিল যেন স্বয়ং মহালক্ষ্মী ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেদিনকার লীলা বিলাস-বৈভব-মূর্ত্তি দেখিয়া শশীবাবু এবং অনেকেই সে ভাবে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

নিরঞ্জন কলিকাতা হইতে ঢাকায় ইন্‌কাম টেক্‌স্ বিভাগের এসিষ্টেণ্ট কমিশনার হইয়া আসিলেন। একদিন সন্ধ্যায় আমরা দুইজন শাহ্‌বাগে অমাবস্যার কীর্ত্তনে গেলাম। কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মার ভাবান্তর হইতে লাগিল। যে অবস্থায় বসিয়াছিলেন, তাহা হইতে ধীরে ধীরে সোজা হইতে লাগিলেন এবং মাথা ক্রমশঃ পিছন দিকে বাঁকিয়া পিঠের সঙ্গে ঠেকিল। তার পর হাত পা মোড়ামোড়ি দিয়া আস্তে আস্তে শরীর মেজের উপর ঢলিয়া পড়িল। পরে প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আপাদ-মস্তক দুলিতে লাগিল এবং ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত তালে তালে সকল শরীর মাটিতে লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দমকা হাওয়ায় গাছের ঝরা পাতা যেমন গড়াইয়া যায় ঠিক সেই ভাবে মায়ের শরীরটা গড়াইতে লাগিল— যাহা সাধারণ লোক শতচেষ্টায়ও করিতে পারিবে না। সকলেরই মনে হইল যেন সংজ্ঞাহীন অবশ শরীর নিয়া লীলাময়ী মা ভাবের তরঙ্গে নৃত্যরতা। মাথায় বা গায়ে বস্ত্রাদির প্রতি কোন খেয়ালই নই। তাঁহাকে ধরিয়া রাখার অনেকবার চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কেহই সমর্থ হইল না। শেষে মা অনেকক্ষণ জড়বৎ পড়িয়া রহিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন এক অখণ্ড রসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। মায়ের মুখশ্রী দিব্যজ্যোতিতে পরিপূর্ণ, সারাদেহ পূর্ণা-নন্দে ঢল ঢল। ৺নিরঞ্জন মার এই ভাবাবস্থায় প্রথম

হইতেই দেবী স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, —"আজ সাক্ষাৎ দেবী-দর্শন করিলাম।"

আর একদিন শাহ্‌বাগে কীর্ত্তনে বহুলোক সমাগত; ধীরে ধীরে কীর্ত্তন চলিতেছে। পূর্ব্বোক্ত অমাবস্যা রাত্রির মত মার ভাবাবেশ হইল। কিন্তু এবার বসা অবস্থাতেই মা ধীরে ধীরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা লম্বা করিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। অবশেষে ঢেউয়ের মত তাড়াতাড়ি গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উন্মাদিনীর মত উপর দিকে বিনা অবলম্বনে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ পায়ের দুই গোড়ালির উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ স্থগিত বোধ হইল। দুই হাত আকাশের দিকে উর্দ্ধে উঠাইয়া রাখিয়াছেন— মাটির সঙ্গে পায়ের গোড়ালির সামান্য স্পর্শমাত্র রহিয়াছে মাথাটি পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া পৃষ্ঠলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; আর অনিমেষ দৃষ্টিতে উর্দ্ধপানে চাহিয়া চলিতেছেন,— কাঠের পুতুল অদৃশ্য হাতের চালনায় যেমন করিয়া চলে ঠিক তেমন ভাবে তিনি বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল, মুখে হাসি ও প্রফুল্লতা। একটু পরেই, কেবল দুই পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর রাখিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপলক উর্দ্ধ দৃষ্টিতে উর্দ্ধবাহু হইয়া শূন্যে চলার মত চলিতে লাগিলেন, যেন সমস্ত

শরীরের গতি উপর দিকে খেঁচিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। পরে একস্থানে চোখ বুজিয়া সেই ভাবেই মাটিতে পড়িয়া গেলেন। অন্যান্যবার মায়ের মাথা সোজা থাকিত কিন্তু সেদিন আর তাহা হইল না। একটি অসাড় মাংসপিণ্ডের মত শরীরটি পড়িয়া রহিল। পর দিন প্রাতে প্রায় ১০টার সময় হইতে একটু একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া সন্ধ্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরে ৺নিরঞ্জনের বাসায় একদিন কীর্ত্তন হইল। সকলেই, বিশেষতঃ ৺নিরঞ্জনের বৃদ্ধামাতা মায়ের মহাভাব দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব; মনে মনে মার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন যেন ভাবাবিষ্টা মাতৃমূর্ত্তি তাঁহাদের দর্শন হয়। যে ঘরে কীর্ত্তন হইতেছিল, তৎসংলগ্ন একটি ঘরে মা শুইয়া পড়িয়াছিলেন; হঠাৎ কীর্ত্তনের নিকট শ্রীশ্রীমা ছুটিয়া গিয়া অলৌকিক ভাবে কীর্ত্তনে যোগ দিলেন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মেজের উপর পড়িয়া গেলেন। সেদিন প্রকৃতিস্থা হইলেন বটে কিন্তু একিবারে মৌন হইয়া রহিলেন।

উক্ত লক্ষণাদি ব্যতীত তাঁহার ভাবদেহের প্রকাশ-বেগ এত রকমে প্রকাশ পাইত যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শরীর যখন গড়াইত তাহা কখনো লম্বা কখনো বা খুব বেঁটে, কখনো গোলাকার মাংসপিণ্ডের

আকার ধারণ করিত। এক এক সময় মনে হইত, শরীরে যেন হাড় নাই। রবারের বলের মতো মাটির উপর গড়াইয়া নাচিয়া চলিয়াছে। তাঁহার দেহের চলন-ভঙ্গী এত ক্ষিপ্রগতিতে বিদ্যুচ্চমকের মত সম্পন্ন হইত যেন তীক্ষ্ণ সচকিত দৃষ্টি দ্বারাও তাহার অনুসরণ সম্ভবপর হইত না।

এই সময় মনে হইত এদেহ যেন শ্রীশ্রীমায়ের নয়; যেন কোন স্বর্গীয় ভাবের প্রবাহ মায়ের শরীরকে আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার সকল শরীর রোমাঞ্চে কণ্টকিত, দেহের বর্ণ অরুণ হইয়া উঠিত। দৈবীভাবের স্বতস্ফূর্ত্ত লক্ষণাদি তাঁহার দেহ-সীমার মধ্যে সীমাতীতের অপরূপ লাবণ্যের ছন্দে লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে।

কখন উন্মাদিনীর মতো ললিত নৃত্য যেন তাঁহার দেহকে অতিক্রম করিয়া চলিত; কখনো বা অতল সাগরের মহামৌন স্তব্ধ প্রশান্তি সমবেত ভক্তজনের প্রাণে অপরূপ ভাব জাগাইয়া তাহাদের মনের নানাবিধ বহুমুখী গতিকে স্থগিত করিয়া দিত।

তাঁহাকে দেখিয়া তখন মনে হইত তিনি যেন উপরোক্ত সকল বিভূতির অতি উর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছেন; ঐগুলি যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁহার শরীরের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে।

আমি একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যখন আপনার

ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি

[৪২ পৃষ্ঠা
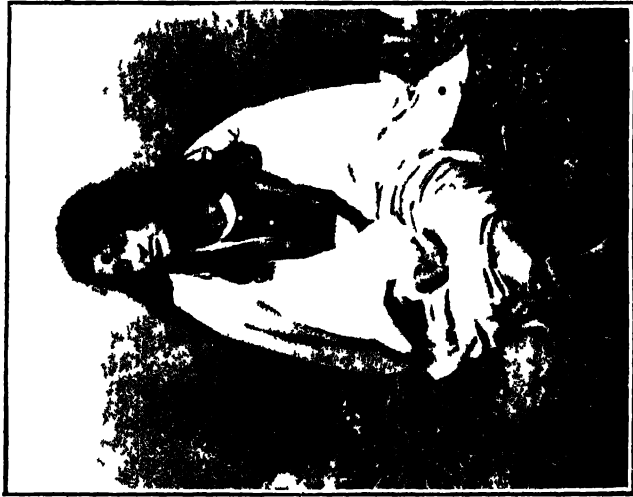
ভাবাবেশ হয়, তখন আপনার শরীরে বা চোখের সম্মুখে কোন দেবতার আবির্ভাব হয় কি? মা বলিলেন,—"আমার লক্ষ্য কোথায়ও আবদ্ধ নাই। ইহার কোন প্রয়োজনও আমার নাই! তোরা ভাবাবেশের লক্ষণ দেখিতে চাস্, তাই এ শরীরে কখনো কখনো তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যখন যে কোন কর্ম্ম পূর্ণভাবে হয় তখন সেই সেই কর্ম্মের তদ্রূপতা প্রকাশ পাইবেই পাইবে। নামে তন্ময়তা আনিতে পারিলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম ও নামী অভেদ বলিয়া সে সময়ের জন্য বহির্জগতের ভাব লুপ্ত হয় এবং নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তাহা আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে।

কীর্ত্তনে যেমন মার শরীরের লোকাতীত অবস্থা আসিয়া পড়িত, মার মুখে শুনিয়াছি যে জল, অগ্নি, মাটি, পশু-পাখী বা কোন বিশেষ দৃশ্যাদি দেখিলেও কখনো কখনো তিনি তদ্রূপ হইয়া যাইতেন। ঝটিকা বাতাস দেখিলেও, কাপড়ের মত তাঁর শরীরটা উড়িয়া গিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিতে চাহিত। আবার কোন গম্ভীর ধ্বনি (যেমন শঙ্খের আওয়াজ) শুনিলে তাঁহার শরীর পাথরের মতো স্থির হইয়া যাইত। শ্রীশ্রীমায়ের খেয়ালে যখন যে কোন ভাবের খেলা আসিয়া পড়ে, আপনা হইতেই তখনি তাহার অনুরূপ ক্রিয়া তাঁহার সকল দেহে ব্যাপক হইয়া প্রকাশ পায়।

একবার ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের হাসি-খেলায় যোগ দিয়া এমন ভাবে হাসিতে লাগিলেন যে প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার হাসি থামানো যায় নাই। ২।১ মিনিট চুপ করিয়া থাকেন, আবার হাসিতে আরম্ভ করেন। একাসনে বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু মুখ চোখের অসাধারণ ভাব। সকলে এ অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইল। পরে ধীরে ধীরে আপনা আপনিই প্রকৃতিস্থা হইলেন।

একবার ঢাকা হইতে কালিকাতায় যাইবেন। ষ্টেশনে ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, পুরুষ অনেকে দর্শন করিতে আসিয়া কান্নাকাটি করিতেছেন। মাও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ওলট পালট করিয়া এমন কান্না জুড়িয়া দিলেন যে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা কঠিন। ষ্টেশনে বহু লোক। অনেকে বলাবলি করিতে লাগিল যে বোধ হয় মেয়েটিকে বাপের বাড়ী হইতে লইয়া যাইতেছে সে কান্নার বেগ বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ করিয়া একটু একটু করিয়া থামিতে থামিতেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিল।

একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোদের হাসি কান্নার কেন্দ্র কোথায়?" আমি বলিলাম, যদিও হাসি কান্নার প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে উদ্গত হয়, তাহার কেন্দ্র হৃৎমর্ম্মে।" মা বলিলেন—"না, যে হাসি কান্নাতে প্রকৃত ভাব থাকে তাহার প্রকাশবেগ সর্ব্বাঙ্গ হইতে ফুটিয়া

উঠিবে।” আমি কথাটি বুঝিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। কিছুদিন পরে ভোরে আশ্রমে গিয়াছি। সাক্ষাৎ হইলে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“মা কেমন আছেন?” মা কিরূপ এক অদ্ভুত জোরে সহিত বলিয়া উঠিলেন—“খু-ব ভা-লো আছি।” এই কথার স্পন্দনে আমি চলিতে চলিতে থমকিয়া গেলাম, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ কি এক অদ্ভুত ভাবে নাচিতে লাগিল। মা তাহা দেখিয়া বলিলেন—“কেমন বুঝ্লি তো হাসির স্থান কোথায়? শরীরের অঙ্গবিশেষে যতক্ষণ কোন ভাব নিবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পূর্ণভাব বলা যায় না।”

শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শুনিয়াছি যখন সাধকের ঈশ্বরভাব একমুখী হইতে আসে তখন বহির্জগতের প্রতিকূল ভাব-স্পন্দন সাধকের ভাবধারায় প্রতিহত হইয়া বেদনা জন্মায়। এমন কি এই সময় কেহ কোন পশুপক্ষী বৃক্ষলতা ইত্যাদিতে আঘাত করিলেও তাহার স্পন্দন আসিয়া সাধকের মনে বিশেষ ব্যথার উদ্রেক করে। অপরের কলহ বা আনন্দ উৎসবাদির তরঙ্গ আসিয়া ঈশ্বর-যোগের একতানতায় আঘাত করিতে থাকে।

যতক্ষণ সাধকের বহির্জগতের সংস্কার বলবান থাকে তখন তাহার মনে হয় তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সবই তাহারা “আমির” অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। তাই একটি গাছে পাতা পড়িলেও সে স্পন্দন চিত্তভূমিকে কাঁপাইয়া

যায়। শ্রীশ্রীমায়ের স্বতস্ফূর্ত্ত কর্ম্মাদির প্রথম উন্মেষে তাঁর মধ্যেও অনুরূপ ভাবের প্রকাশের কথা শুনা গিয়াছে।

মহাভাবের পর শ্রীশ্রীমা যখন শান্তভাবে ফিরিতে থাকিতেন তখন তাঁহার শরীরে নানা প্রকার যোগক্রিয়াদি আপনা হইতেই প্রকাশ পাইত। সেই অবস্থায় তাঁহার শরীর হইতে এক অস্পষ্ট ধ্বনির গুঞ্জরণ প্রথমে শোনা যাইত। তাহার কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের অশান্ত আঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রবাহের মতো ছন্দায়িত দেবভাষায় স্বতোদ্গত সত্যবাণী অপরূপ মধুরতার সহিত অনর্গল বহিয়া যাইত, মনে হইত যেন মহাব্যোম হইতে নানা রূপ রাগিণীর অপূর্ব্ব ঝঙ্কার লইয়া সত্যের স্বরূপ বাণীরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ, এমন সাবলীল ছন্দের প্রাণস্পর্শী প্রবাহ, তাঁহার মুখের এমন নির্ম্মল-পাবন জ্যোতি পণ্ডিতেরা শত-চেষ্টাতেও আয়ত্ত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

এই সকল স্বতোৎসারিত বাণীর অর্থসমৃদ্ধিতে বিদ্বৎ-মণ্ডলীও স্তম্ভিত হইয়াছেন, উহার ভাষা সকলের বোধগম্য নয় বলিয়া যথাযথ লিপি করা সম্ভব হয় নাই। এইরূপ চারিটী সূত্র পরে দেওয়া গিয়াছে।

ইহাদের সংশোধনের জন্য পরে মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিতেন,—"যদি হওয়ার হয় সময়ে হইবে, এখন ত মনে কিছু আসেনা।" পরবর্ত্তী চারিটী সূক্তের মধ্যে একটীর অর্থ

কয়েকজন বৈদিক ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে ফুটনোটের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে।

এই একটি সূক্তের অর্থ হইতেই প্রতীতি হইবে যে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবদেহ জগতের কল্যাণ, শান্তি ও অভ্যুদয় উপলক্ষ করিয়া বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রাণের আবেগ, অশ্রুস্নাত অপরূপ করুণা জীব-হিতের জন্য বিশ্বময় বিস্তার করিয়া তিনি যেন বিশ্বময়ী রূপে বিরাজ করিতেছেন।

এই সকল সূক্তের প্রসঙ্গে মার মুখে শুনিয়াছি—"শব্দই জগতের আদি কারণ; নিত্য শব্দ বা সদ্‌বাণীর ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সৃষ্টিরও বিবর্ত্তন বা বিকাশ সমান ধারায় চলিয়াছে।" এই সময়ে তাঁহার বাণী কখনো ক্ষুরধারের মতো নিশিত, তীব্র; কখনো দিবাশেষের সমুদ্র বায়ুর মতো স্নিগ্ধ; কখনো পূর্ণিমার মধ্যরাত্রির মতো নিবিড় প্রশান্ত। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি ও মুখের ভাব বিকাশ অনুরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

কোন কোন দিন সূক্তাদি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবিরল অশ্রুধারা, অপরূপ উজ্জ্বল হাস্যের দীপ্তি, অথবা মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলার মতো হাসি-কান্না আসিয়া তাঁহার করুণময়ী মূর্ত্তিকে স্বর্গীয় বিভূতি দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত। এই সকল বাণী প্রকাশের পর কখনো কখনো

অনেকক্ষণ মৌনী থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থা হইতেন, কোন কোন দিন অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিতেন।*

এহি ভাবনায়ং ভায়ং এহি যং সং তানি তায়ং
ভাবময়ং ভবভয়হরণং হে।
যস্মিংস্ত্বহং ভাগ পৌং হং বাং ক্রীং আং হে
ভাং হাং হিং হৌং হং হ্রীং বং লং যং সং ত্বং
তাদরৌ ভাগ সং বং লং হে দেব ভক্তময়ং মম হে।
স ত্বং হি হং যং বং বায়ং কং ভাবভক্তি ······ ভাবময়ং হে।
মহাত্মায়ং ভবভয়ং হর হে।
দৈবতং ময়ং মে সং তং হ্রীং মত্তস্ত্বম্ ভবোঽয়ং
য স্তানি ত্বং তারণময়ম্ ভবভয়নাশং ভাবয় হে।
স্বভাবশরণগতং প্রণবজাসনং।
ভবানীভবং ভবভয়নাশনং হে,
হরশরণাগতং ··· ···তায়ং
বিভাবতঃ মমায়নং হে।
যস্তারণং তত্র দ্বয়রূপং ময়াহি সর্ব্বাণি স্বরূপময়ানি
ময়াহি সর্ব্বঃ ময়াহি সর্ব্বশরণং হে।
দাস নিত্যং···প্রণবশ্রুতকারণং
মহামায়া মহাভাবময়ময় হে।
মম ভো ভক্তৌ তরণং মা মেম সর্ব্বময়ং হে

---

* শ্রীশ্রীমায়ের তন্ময় ভাবোন্মাদনার কয়েকটি ছবি এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইল।

যস্যা রুদ্ররুদ্রত্বং প্রণবে রাং ঋং কৃতকারণং রুদ্রং নৌমি।
প্রাং বাং হাং সাং আং হিং অং
ভাবময়ং হে ··· ··· সংস্পৃষ্টঃ কেশবঃ

---

* এই স্তোত্রে ব্যবহৃত কয়েকটী প্রচলিত বীজের প্রধান প্রধান অর্থ দেওয়া হইল ঃ—

লং—পৃথ্বী, বিমলা, বেদার্থসার, নারায়ণ।

যং—বায়ু, কালী, পুরুষোত্তম চামুণ্ডা, যুগান্তশ্বসন।

বং—বরুণ, বিষ্ণু।

তং—হরি

অং —আকাশ, সর্ব্বেশ।

আং—নারায়ণ, অনন্ত।

সং—হংস, জগদ্বীজ, সোহং, পরমাত্মা।

হং—পরমাত্মা, হংস, শিব।

হৌং—প্রাসাদাখ্য শিববীজ।

ঋং—রুদ্র, মহারৌদ্রী।

কং—মহাকালী, কামদেব, বাসুদেব, অনন্ত।

ক্রীং—শক্তি বীজ, কালীবীজ।

হ্রীং—তারাবীজ, ভুবনেশ্বরীবীজ, মায়াবীজ।

ভাং—অনন্তবিশ্বমূর্ত্তি।

২০শে বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে **শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী** নবপ্রতিষ্ঠিত রমণাপ্রান্তরস্থ আশ্রমে ২৪ ঘণ্টাকাল অবস্থানের পর হঠাৎ ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক একবস্ত্রে বাহির হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে ভাবাবেশে স্বভাবতঃই একটী স্তোত্র তাহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত

(২)

নামঃ স্মরণং সর্ব্বঃ ছত্তম্।
সবিনয় ময় ভবতঃ।
য সমেদনামং সর্ব্ব ভূতেসী সমম্বয়েঃ
সর্ব্বং স্বরূপে নিত্যং অনিত্যং মমঃ।

হয়। ঐ স্তোত্রটীর কিয়দংশ আবৃত্তির পর ঐটী লিখিবার জন্য তিনি ভক্তগণকে অনুমতি দেন। কিন্তু তাঁহার আবেশজড়িত-কণ্ঠনির্গলিত এই স্তোত্রটীর অতি অল্প অংশই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, এবং যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাও যে যথাযথভাবে হইয়াছে এমন বলা যায় না। তবে তিনি এই অসম্পূর্ণ এবং লিপিকরের ভ্রম ও চ্যুতি দ্বারা অঙ্গহীন স্তোত্রটীই কীর্ত্তনের পূর্ব্বে যন্ত্রসংযোগে গান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। নিম্নে এই স্তোত্রটীর মর্ম্মানুবাদ যথা সম্ভব দেওয়া গেল।

তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং নিখিল ভাবনায়ক, তুমি আবির্ভূত হও। তোমা হইতে অবিরত সৃষ্টিজাল বিকীর্ণ হইতেছে, তুমি ভবভয়হারী, তুমি আবির্ভূত হও। তুমি অখিলবীজস্বরূপ, এবং তুমিই সেইজন যাহাতে আমি অবস্থান করিতেছি। এই যে আমার ভক্তগণ তাহাদের মধ্যে তুমিই বিরাজ করিতেছ। এই যে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই তুমি ভবভয়হরণ কর। হে সর্ব্বদেবময়, আমা হইতেই তুমি এবং আমিই বিশ্বজগৎ। যে তারণময় এতৎসমস্তের অধিষ্ঠানভূমি সেই ভবভয়নাশকারীকে ভাবনা কর। তুমি নিত্য স্ব-স্বভাব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ। প্রণবজ অর্থাৎ বেদসমূহের তুমিই প্রতিষ্ঠাভূমি। তুমিই সমরসীভূত নাদবিন্দ্বাত্মক কামকামেশ্বরীরূপ দিব্যমিথুন, তুমি ভবভয়নাশ কর। আমি তোমার শরণাগত, তুমিই আমার আশ্রয়, তুমি

স্বস্তবয়া নঃ সিহং, শঙ্কর সবিস্ময়ে নমঃ নঃ স্বয়ম্ভুং ;
নঃ মিব ভব সিহং সঞ্চিত মাদনে স্বয়ং স্মিতি স্মৃতি,
র বিপরনমং ভবঃ তমাহং ।
মায়া বিভিত মাদনে ছরনে মে স্বহং
ছ পিপাতনে মাতঙ্গং সাহারণং
রঞ্জিতং শোভিবতঃ মিজনে জানং
র তিন বেত্তঃ বেদনং মিদাহনং স্বপিপ সার নমেঃ
ছ তিন মাহং স্বপিপা সনমং
রোগ ক্লান্তি তিঁন মে স্বহং
ফঃ বিব মাতয়েঃ

(৩)

যং তারিণী যৎ স বে সম যৌ তিপারিতং হস্তে সংস্তে জগম্।
রূপাদিত্যং করুণে রৌদ্রস্থ রূপকারস্মি ছন্তে নিমিস্ত নমং ॥
আঃ ইঃ উঃ হং সং রং লং যং সং হং হং ঋং ক্রীং অং গং গুং গং।
রাং রাং রাং রোম্ রোম্ রোম্ ॥ দ্রবে দিত্যং শাস্ত শিষৈস্যো স্থানিত্যং ॥

আমাকে তোমাতে আকর্ষণ করিয়া লও। তুমি যখন তারক—তখন তোমার দ্বিবিধরূপ—মোক্ষদাতা ও মুমুক্ষুজীব। আমাদ্বারাই সকলে স্বরূপময়। আমাদ্বারাই সকল, আমাতেই সকল আশ্রয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি। আমিই সেই প্রণবোপদিষ্ট কারণ, আমিই একাধারে মহামায়া এবং মহাভাবময়। আমাতে যে ভক্তি তাহাই মোক্ষের হেতু। সকলই আমার। যে আমা হইতে রুদ্রের রুদ্রত্ব সেই আমি কার্য্যকারণাত্মক রুদ্রকে স্তুতি করিতেছি।

রিপু কারণম্ মহামায়ে আলক্তিললং গাঃ গিঃ সং স্তজস্মি। অগ্নেপিত-কেন্তনং আং দং পিং আঃ সঃ বিত্রদয়ং নঃ সৌঃ রিতীঃ ॥

অং শং স্যং রাং রাং ... ... হ্রীং হ্রীং ধনমেদিত্যঃ অহম্ স্তে জগম্ ॥

আং আং ইং .... ওঁ স্তেজস্য স্বর বর্গেষু শস্তি সেবতং ইত্ব নিরাহারাং।

সমিদেঃ যং পুরানিতা অন্যে পে ঋক্ ওম্ অর নিরাত্রিস্থং যশমেদি

পুরাণে লভিদা দনমে দাত্তাং রক্ষক ময়া সিতং জনমে শান্তি স্বরূপিণী

বিত্যা রুদ্রাত্তনমে অন্নপূর্ণা সন্নিদত্তা যশ বেদা বিহ্বলাং স্মরণে স্মরণান্বিতং ওঙ্কারস্য সমেশং যত্তাত্তনমে ক্রীং রং

শান্তি অভবা বিভূষিতং !!!

(৪)

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি
শ্রদ্ধার্থনং শঙ্কট উবাচ
নৈস্থংহ উগ্‌গতা নমে।
নরোরূপ ভ্রমন্বয়েঃ
সংস্তিচং ভ্রূতপাঃ মহৎ ময়ায়াং
ষ্টসনা রুদ্রং পিয়াস্ব মেঃ।

যখন আমি আকুলতা ব্যাকুলতায় খুব বিধ্বস্ত হইতাম সে সময়ে হঠাৎ একদিন শ্রীশ্রীমাতাজীর শ্রীমুখ হইতে এ শ্লোকটি নিঃসৃত হইয়াছিল। প্রত্যহ সকালে বিকালে ইহা পাঠ করিবার জন্য আমার উপর আদেশ ছিল।

যোগ বিভূতি

মা বলিয়াছেন এমন একটা অবস্থা তাঁহার মধ্যে কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছিল যখন তাঁহার শরীরে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নানাবিধ আসন, বন্ধ, মুদ্রাদি স্বতঃ স্ফুরিত হইত। এই সকল যৌগিক বিভূতি অনেক সময় লোক দৃষ্টির অন্তরালেও ঘটিত। এ সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন—"যেমন বীজটি অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে মাটি চাপা দিয়া অন্ধকারে রাখিতে হয় তদ্রূপ জীবের সাধন অবস্থায় প্রত্যক্ষ কর্ম্মাদির পশ্চাতে অপ্রত্যক্ষরূপে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

সময় সময় তাঁর হাত, পা, শিরোদেশ এমনি বাঁকিয়া যাইত, বোধ হইত উহা যেন আর সোজা হইবেই না। মা বলিয়াছেন, "কখনো কখনো আমার শরীর হইতে এমন জ্যোতির ছটা উদ্গত হইত তদ্দ্বারা যেন চারিদিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া পড়িত। সেই জ্যোতি যেন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে এমন মনে হইত।" ঐ অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে সর্ব্ব শরীর কাপড় দিয়া ঢাকিয়া একান্তে পড়িয়া থাকিতেন।

এই সময় তাঁহার শরীর হইতে এমন এক দিব্য শক্তির স্ফুরণ হইত যে তাঁহার দৃষ্টিতে লোক আত্মহারা হইয়া যাইত কিংবা তাঁহার চরণাদি স্পর্শে কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত।

তখন যে যে স্থানে মা বসিতেন বা শুইতেন সেই সেই স্থানে আগুনের মতো গরম হইয়া থাকিত।

ঢাকায় আমি নিজেও শ্রীশ্রীমায়ের অনেক রকম আসনাদি দেখিয়াছি। কোনো কোনো সময় আমি দেখিতে পাইতাম তাঁহার শরীরে শ্বাসের ক্রিয়া এরূপ ঘন ঘন হইত যে আশঙ্কা করিতাম পাছে না দম্ আটকাইয়া যায়, আবার একেবারে ক্ষীণ শ্বাস বা শ্বাস শূন্যতাও দেখা যাইত। একবার কতগুলি আসনের ছবি মাকে দেখান হয়, কয়েকটি ছবি লক্ষ্য করিয়া মা বলিয়াছিলেন যে ছবিতে উরু, পা, শির প্রভৃতির যোজনা ঠিক মত দেখানো যায় নাই।

যাঁহারা তাঁহার সঙ্গসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন যে এক আসনে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুদ্বেগে কাটাইয়া দিতেন, কখনো কখনো কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ হইয়া যাইতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীরের নড়চড় নাই, দৃষ্টি স্থির, শান্ত ও স্নিগ্ধ। তাঁহার সকল অবস্থাতেই ইহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় যে তিনি যেন অন্তরে কি এক বিরাট আনন্দে অনুক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়া বাহিরের শরীরের দ্বারা লৌকিক ব্যবহারাদি নিষ্পন্ন করিতেছেন। অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে শীত গ্রীষ্মাদি বোধ বা শরীরের আহার-বিহারাদি স্বাভাবিক কর্ম্মে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া না দিলে তাঁহার খেয়ালই থাকিত না। স্মরণ করাইয়া দিলেও তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক ভাব তাঁহার সহজে

জাগিত না। কখনো দেখিয়াছি বহুদিন একভাবে চলিলে, কথা বলা, হাঁটা, হাসি এমন কি জল ভাত তরকারী পর্য্যন্ত তাঁহার ভুল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন শ্রীশ্রীমায়ের কোনও বিভূতির দৃষ্টান্ত আছে কি? যাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তের জীবনই বিভূতিমান, যাঁহার চিরকল্যাণময়ী জীবনের স্পন্দনে শুষ্কপ্রাণও মঞ্জরিত হইয়া ওঠে, যাঁহার স্বতোদ্গত ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অলক্ষ্যে অধ্যাত্মপথে জীবের চিত্তগতি প্রসারিত হয়, তাঁহার কোন বিভূতির পরিচয় না দিয়া আমি তাঁহাদিগকে বলি কিছুদিন মায়ের সঙ্গলাভ করিয়া নিজেই তাঁহার বিভূতি অনুভব করিয়া কৃতার্থ হউন।

আমি ও ৺ নিরঞ্জন একদিন শাহ্‌বাগ গিয়াছি। মা ও পিতাজী বসিয়া আছেন; মায়ের সামনে কতগুলি চিত্র মাটির উপর আঁকা রহিয়াছে। পিতাজী বলিলেন, তোমাদের মা ষট্‌চক্র আঁকিয়াছেন। মা বলিতে লাগিলেন—"আজ দুপুর বেলা হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ এইস্থানে আসনস্থা হইয়া বসিয়া গেলাম। ব্রহ্মতালু হইতে নাক বরাবর মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত নিজের হাতের আঙুল দিয়া (কোথায় ৩ আঙুল কোথায় ৪ আঙুল অন্তর অন্তর) মাপিতে লাগিলাম এবং খেয়াল হইতে লাগিল যে ঐ ঐ স্থানে এক একটি গ্রন্থি আছে। আমি দেখিতে লাগিলাম মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধ-দিকে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অনেকগুলি গ্রন্থি, তার মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি প্রধান। সেগুলি এখানে

আঁকা গিয়াছে, আমি ইচ্ছা করিয়া আঁকি নাই, আমার হাত আপনা হইতে ঘুরিয়া গিয়াছে এবং এই সব ছবি আঁকা হইয়াছে। মনে রাখিস্ এই সব গ্রন্থিতে বা নাড়ীগুচ্ছগুলির সংযোগ ক্ষেত্রে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি জনিত মানুষের জন্মমৃত্যুর সংস্কার আবদ্ধ রহিয়াছে। বায়ু ও প্রাণরস ইহাদের ভিতর দিয়া কোথাও দ্রুত, কোথাও বা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া মানুষের কর্ম্ম ও ভাবের গতিকে চালিত করে। যেমন পৃথিবীর উপর জল, জলের উপর তেজ, তেজের উপর বায়ু এবং বায়ুর উপর মহাব্যোম তেমনি মানুষের শরীরের ভিতরেও এক একটি করিয়া পাঁচটি কেন্দ্র স্থিত রহিয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবি যে যখন মনের ভাবগুলি অনাবিল ও আনন্দময় থাকে তখন প্রাণবায়ু শরীরের উর্দ্ধে বিচরণ করে। যেমন দেখিতে পাস্ পুষ্করিণীর তলদেশে জলের আদি প্রস্রবণ, বৃক্ষের মূল-দেশে প্রাণরসের আকর্ষণ কেন্দ্র, তদ্রূপ মানুষের মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে জীবনী শক্তির আদিস্বরূপ একটি মহাশক্তি সুপ্ত ভাবে রহিয়াছে। শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যের সহিত বাহ্য এবং আন্তর শুদ্ধক্রিয়ার স্পন্দন বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া যখন প্রধান প্রধান নাড়ী-কেন্দ্রগুলি আলোড়িত করে, তখন মূলাধারের বদ্ধশক্তি উন্মুখী হইয়া এক একটি গ্রন্থিকে ভেদ করিয়া যতই ক্রমশঃ উর্দ্ধে সঞ্চারিত হয়, ততই সাধকের জড়তা ও সংস্কার লয় হইয়া যায়। এই গ্রন্থি-মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের

রূপ-রসাদির প্রতি আসক্তির সংস্কারগুলিও শিথিল হইতে থাকে। এই উন্মুখী শক্তি ভ্রূকেন্দ্রে পৌঁছিলে বায়ুর গতি সর্ব্বত্র সরল ও বিশুদ্ধ হইয়া যায়; তখন সাধক—'আমি কে? জগৎ কি? সৃষ্টি কি?' ইত্যাদির স্বরূপ কিছু কিছু অনুভব করিতে পায়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে সংস্কারের মূলোচ্ছেদ হইতে থাকে এবং উত্তরোত্তর ধ্যানাদির গতি উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর সোপানে আরূঢ় হয়। সর্ব্বশেষ স্তরে উপনীত হইলে সাধক মহাভাবে লীন হয় অর্থাৎ স্বরূপে স্থিতি লাভ করে বা সমাধি-ভূমিতে শান্তি লাভ করে। এই সব গ্রন্থি খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রথম সাধক নানা প্রকার ধ্বনি শুনিতে পান, সময়ে সময়ে তাঁর মনে হয় এই সকল শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনিবৎ শব্দ-তরঙ্গ এক বিশ্বব্যাপী মহাধ্বনির সাগরে মিশিয়া যাইতেছে; তখন বাহিরের কোন ভাব বা বস্তু সহজে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। সাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তিনি মহাধ্বনির অমৃত প্রবাহে তলাইয়া যাইতে থাকেন; শেষে মহাধ্বনির অতল গভীরতায় তাঁহার চিত্ত অখণ্ড স্থিতি লাভ করিয়া থাকে।"

শ্রীশ্রীমায়ের এই উক্তির প্রায় ২।৩ বৎসরের পর Justice Woodroffe এর Serpent Power বহিখানির ষটচক্রের ছবিগুলি মাকে দেখাইতে নিয়া গেলাম। মা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না দিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন—"আমি কি বলি শোন্।" তিনি প্রত্যেক চক্রের পদ্মের দলসংখ্যা,

যন্ত্র, বীজ, বর্ণাদি বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম মার কথাগুলি ছবির সঙ্গে মিলিয়া গেল। মা বলিলেন—"আমি কোনও বইতে বা কারো মুখে এই সব শুনি নাই; কথা-প্রসঙ্গে এই সব বাহির হইয়া গেল।" মাকে জিজ্ঞাসা করাতে মা আরো বলিলেন,—"ছবিগুলিতে যে সব রঙ্ দেখিতেছিস্, উহা বাহিরের সাজ মাত্র। আমাদের শরীরের মজ্জাদি যে বস্তুর দ্বারা গঠিত চক্রগুলিও তাই, তবে পার্থক্য এই যে বাহিরের নাভি, চোখ, কান, হাতের রেখা ইত্যাদির যেরূপ বিশিষ্টতা সেরূপ চক্রগুলির গঠনও বিভিন্ন; বায়ুর গতি ও প্রাণশক্তিজনিত রসপ্রবাহের দ্বারা নানাবর্ণের খেলা ও বীজাদির মূর্ত্তি ও ধ্বনি তথায় লক্ষিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রথম প্রথম বীজাদি বাহির হইত তখন খেয়ালে আসিত,—এ সব কি? অমনি আপন মুখ দিয়া প্রত্যেকটির সম্বন্ধে জবাব পাইতাম এবং আমি পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিতাম যে কোন কোন স্থানে কি কি আছে। সে সময়ে প্রতি চক্রের বিবরণ তোর ঐ সব ছবির মত দেখিতে পাইতাম। উপাসনা, পূজা, কীর্ত্তন, ধ্যান, তত্ত্ববিচার ও যোগাদি ক্রিয়া ঐকান্তিকতার সহিত চলিতে থাকিলে আপনা হইতেই চিত্তশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি হইয়া গ্রন্থিগুলি খুলিয়া যায়। অন্যথা জীব কাম ক্রোধাদির ঘূর্ণি হইতে সহজে উদ্ধার পাইতে পারে না।"

একদিন মা সমবেত জনমণ্ডলীকে নিয়া ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী

আসনে গেলেন। ঐ স্থানটি তখন অনাদৃত ছিল। সেখানে এক বিঘৎ উঁচু ও সওয়া হাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট চতুষ্কোণ একটি বেদী ছিল। মা তাহার উপর আসনস্থা হইলেন। ভক্তেরা চারিদিকে আপন আপন ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল যে মা আসনের স্বল্প জায়গাটুকুর মধ্যে শরীর এরূপ সঙ্কুচিত করিয়া নিলেন যে সকলের মনে হইতে লাগিল আসনের উপর কেবল মায়ের পরিধেয় বস্ত্রখানিই পড়িয়া আছে। মাকে দেখাই যাইতেছিল না। সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, পরে কি হয়! ক্রমে ক্রমে একটু একটু নড়াচড়া দেখা যাইতে লাগিল এবং আস্তে আস্তে বেদীর উপর মা সোজা হইয়া বসিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে উর্দ্ধপানে চাহিয়া, বলিয়া উঠিলেন—"তোমাদের কর্ম্মের জন্য এ শরীর তোমরাই নিয়া আসিয়াছ।"

মা বলেন,—"কাগজের ঘুড়ি যেমন একমাত্র সূতার অবলম্বনে বাতাসে উড়ে, তেমনই যোগীরা শরীরে শ্বাসের ও সংস্কারের সূত্র ধরিয়া শূন্যে উঠা, সূক্ষ্ম হওয়া, বৃহৎ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া ইত্যাদি অনেক রকম ক্রীড়া করিতে পারে।" শুনিয়াছি স্বপ্নে কেহ মার মুখ হইতে মন্ত্র পাইয়াছেন, কেহ বা মন্ত্রের সঙ্গে ফুলও পাইয়াছেন এবং জাগ্রত হইয়া তাহা দেখিয়াছেন। অথচ মাকে কাহাকেও দীক্ষা দিতে দেখি নাই। অনেকের মুখে শুনিয়াছি মা হয়তঃ ঢাকা কি অন্যত্র

আছেন, তাঁহারা বহুদূরে নিজের বাড়ীতে হঠাৎ অল্প সময়ের জন্য মার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন।

আমার উৎকট রোগের সময় মা কয়েকমাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন। ঢাকা ফিরিয়া আসিলে একদিন আমাকে বলিলেন—"আমি দুইদিন মধ্যরাত্রিতে তোর ঘরে এ দুয়ার দিয়া আসিয়া ঐ দুয়ার দিয়া বহির হইয়া গিয়াছি, তখন তুই খুব কাতর ছিলি।" আমার রোগের আতিশয্য হইলে ডাক্তারকে রাত্রিতেও ডাকা হইত। খরচের খাতা মিলাইয়া দেখা গেল যে মায়ের নির্দ্দিষ্ট দুই রাত্রিই ডাক্তার আসিয়াছিল। এরূপ ঘটনাও হইয়াছে যে বহুলোক বসিয়া আছে, তিনি সকলের চোখের সাম্‌নে দিয়া যাওয়া আসা করিলেন, অথচ তাহার শরীর কেহই দেখিতে পাইলনা। মা বলেন—"আমি তো সর্ব্বদা তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি, তোরা দেখিতে চাস্‌না আমি করিব কি? তোরা জেনে রাখ্ তোরা কি করিস না করিস, নিকটেই হউক, দূরেই হউক যে কোন সময় একটি লক্ষ্য তোদের উপর সর্ব্বদা রহিয়াছে।"

একবার গোয়ালন্দ ষ্টেশনে মা গাড়ীতে উঠিবেন। প্লাট্‌ফরম্ হইতে গাড়ীর দরজা অনেক উঁচুতে। কয়েকদিন হইতে মার ডান হাত অবশ ছিল। মার আদেশে ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া মার বাম হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন, তিনি বলিলেন—"আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি ছোট

শিশুকে টানিয়া উঠাইলাম।” আবার কোন কোন সময় মাকে খুব ভারী হইতেও দেখা গিয়াছে।

মা বলেন—তাঁহার চলা বসা সবই সমান, তিনি সকল সময়েই জাগ্রত। ইহা খুব সত্য। কেননা দেখা গিয়াছে যে কোনদিন শয্যাত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “আমি এইমাত্র ঐ স্থান হইতে আসিলাম, সেখানে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।” পরে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আমি অনেক সময় বিদ্যুৎ রেখার মত হঠাৎ একটি আলো বা ছায়ামূর্ত্তির মতো মাকে আমার নিকটে দেখিতে পাইতাম। কখনো কখনো সে ভাব ঘনীভূত হইয়া নানারূপে খেলা করিত; অনেক সময় সেগুলি সত্যেও পরিণত হইত।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মা ঢাকা হইতে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে কাক্সবাজারে আছেন। আমি ভোরে বিছানায় তাঁর চিন্তায় বসিয়া আছি। দেখি কাণের কাছে খুব আস্তে আস্তে আওয়াজ আসিল—“শীঘ্র আশ্রমে মন্দিরের ব্যবস্থা কর।”

শুনিবামাত্রই আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমি জানিতাম মা সোজাসুজি কাহাকেও কিছু আদেশ করেন না, তবে মনে হইতে লাগিল এরূপ আদেশ মার ব্যতীত আর কার হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এত অস্পষ্ট কেন? কাক্স-বাজারে পত্র লিখিয়া জানিলাম মা কয়েকদিন যাবৎ মৌনী ছিলেন; উক্তদিন প্রাতে ৮ টার সময় তাঁহার কথা খুলিয়াছে।

পরে মা ঢাকা আসিলে জানিলাম যে সেদিন খুব ভোরেই মার কথা খুলিয়াছিল; কিন্তু কেহ ধরিতে পারে নাই। বাস্তবিক মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন তখন হইতেই আরম্ভ হয়।

মৃত সাধুপুরুষদের এবং অন্যান্য অনেকের আত্মা তিনি দেখিতে পান প্রায়ই বলেন, এবং ইহাও বলেন যে 'এইত আমার সম্মুখে তোরা যেমন বসিয়া আছিস্, অশরীরী অনেকে এখানে তেমনিই বসিয়া রহিয়াছেন।'

মা বলেন, "কোন রোগের কি মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই। এ শরীরে তাহারা যখন আসিতে চায়, আমি কোন বাধা দিই না। যখন এক আমিই তখন ত্যাগ বা গ্রহণ কোথায়? তোদের নিয়া আমার যেমন আনন্দ, তাদের লইয়াও তেমন জানিস্।"

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মা ঢাকা ছাড়িয়া আসেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার স্বাধীন ভাবে পর্য্যটনের পথে বিঘ্ন ঘটে। আগষ্ট মাসে ঢাকা ফিরিয়া আসিলে, একদিন জ্বর দেখা দিল। শরীরের নানারকম অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে লাগিল। মা আদেশ দিলেন যে শরীরের স্বতঃস্ফুরিত বিবিধ গতি অনুসারে ইহাকে উঠাও, বসাও এবং শোয়াও। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সেরূপ করা হইয়াছিল। মা বলিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত শারিরীক ক্রিয়াগুলি সবই যৌগিক আসন ছিল। এ সব দেখিয়া সকলের ভয় হইয়াছিল, পাছে মা

রোগপীড়িতা শ্রীশ্রীমা ১৯২৯ ইং [৬৩ পৃষ্ঠা

শরীর ছাড়িয়া দেন। পরে দেখা গিয়াছিল সর্ব্বাঙ্গ অবশ, উঠিতে বসিতে কেউ না ধরিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হেলিয়া পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, শোথ, পেটের অসুখ, রক্তদাস্ত, রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি নানা উপসর্গ ছিল। এ ভাবে ৪।৫ দিন চলিলে ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া নিবেদন করিলেন—"মা আর এ শরীর আমরা চালাইতে পারিনা, তুমি কৃপা কর।" ইহার পর শরীরের অবশ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু জ্বর যেমন তেমনই আছে। মার আদেশ মত ৫।৬ দিন ধরিয়া প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ৬০।৭০ বালতী জল মাথার উপর ঢালা হইত; তবুও জ্বরের তাপ কমে না। ঔষধাদি কিছুই ব্যবহার করেন না। একদিন বিকালে ঢাকার এক বিশিষ্ট কবিরাজ মাকে দেখিয়া বলিলেন—"আমাদের নিদান মানুষের রোগের কথা বলে, ইঁহাদের সবই স্বতন্ত্র।" এত দীর্ঘ দিন এরূপভাবে শয্যাগতা দেখিয়া সকলেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া সুস্থ হইবার জন্য মাকে কাতরতা জানাইতে লাগিল। তার পরদিন ভোরেই মা বলিলেন—"ভাতের যোগাড় কর।" যিনি শরীরের শোথাদি ও জ্বরের বেগে নিশ্চল হইয়া প্রায় ১৭।১৮ দিন যাবৎ পড়িয়া আছেন, তিনি স্বয়ংই তাঁহার অন্ন পথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া সকলে অবাক্। যা হো'ক আদেশানুযায়ী ডাল, ভাত, তরকারী তৈয়ার করা হইল, ৩।৪ জন চারিদিকে বসিয়া মাকে ধরিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিল,

কিছু কিছু সবই খাইলেন। জ্বরের পর এরূপ অন্নপথ্য দেখিয়া অনেকেই ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর হইতে দিনে দিনে তিনি সুস্থ হইতে লাগিলেন।

এইরূপ শরীরের বিকৃতির প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন, —"এ শরীরটা কোথাও আমার কোন সহজাত কর্ম্মে বাধা পাইয়াছিল, তাই বাধার ফলটা কি রকম হইতে পারে তাহা তোদের বুঝাইবার জন্য ইহার নানা যন্ত্রাদির বিকার দেখিয়াছিস্। যদি সত্য সত্যই রোগ হইত, তাহা হইলে এ শরীর একেবারে জড়বৎ হইয়া যাইত, না হয় প্রাণবায়ু এ শরীর ছাড়িয়া যাইত।

আমার শয্যায় শায়িত অবস্থায় কোন অসুখ-অসুবিধার বোধ ছিল না। সুস্থাবস্থায় যেমন থাকি বিছানায় পড়িয়া তেমনই ছিলাম। আমার শরীরের গতিতে এবং তোদের সকলের ছুটাছুটি, ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে বোধ হইত যেন এও এক আনন্দের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন চলিয়াছে।"

শ্রীশ্রীমায়ের কার্য্যাদিতে প্রতিপন্ন হয় যেন প্রকৃতি তাঁহার করায়ত্ত হইয়া তাঁহাকে সহায় দান করে। ইহাতে মনে হয় তাঁহার ইচ্ছাময়ী শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলে, আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্বের তরঙ্গ না তুলিলে, তাঁহার আদেশ অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিপালন করিলে শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বময়ী ইচ্ছাশক্তির অপরূপ সৌন্দর্য্যের খেলায় আমরা কত যে

আনন্দ পাইতাম, এবং উন্নত হইবার কত যে সুযোগ আমাদের অদৃষ্টে ঘটিত তাহার সীমা নাই। ছেলেবেলায় আমরা নিজের খেয়ালে যেমন পুতুল নিয়া খেলিয়াছি, বালি-কাদার ঘর রচনা করিয়া সাময়িক আনন্দলাভের পর আবার নিত্য নূতন খেলায় মত্ত হইয়াছি, তেমনি এখনও মাকে নিয়া অনুরূপ খেলায় মাতিয়া রহিয়াছি,—এবংবিধ আশঙ্কা আমার মনের মধ্যে সময় সময় উদয় হয়।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমে কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একদিন ব্রহ্মচারী শ্রীমান কমলাকান্তকে বলিয়াছেন—"এতদিনেও আমি যে কি চাই কেহ বুঝিল না। বুঝিলে তুমি কি চাও বা আপনি কি চান এ কথা উঠে না। যা'ক যার যতটুকু বুঝিবার ততটুকুই বুঝিবে। বুঝিতে হইলে সেখানে আত্মসম্মান, যশ, গৌরব, রাগ, দুঃখ, অভিমান,— 'আমি করি' এই বোধ ও স্বাধীন ভাব একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হয়।"

যদি আমরা নীরবে তাঁহার বাণী অনুসরণ করিয়া, তাঁহার জীবন্ত প্রভাবে প্রাণের ক্ষেত্র নির্ম্মল করিয়া তুলিতে

বিন্ধ্যাচল অষ্টভুজা পাহাড়ের উপর মায়ের একটি আশ্রম আছে। পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং তুরীয়ানন্দের যত্নে ও অর্থানুকূল্যে উহা প্রতিষ্ঠিত। সেখানে সম্প্রতি অখণ্ড অগ্নিরক্ষার জন্য যজ্ঞকুণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পারিতাম, হয়তো আমাদের মধ্যে এই পরমা মাতৃশক্তির চিন্ময়ী বিলাসলীলা দেখিবার সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য হইতাম, জগৎ ধন্য হইত।

একদিন রমনার মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম মা আর কোন কথাই কহিতেছেন না। তখন জানিলাম মার মৌন ভাব জাগিয়াছে। কতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত নির্ব্বাক ছিলেন। এ সময় ঈসারা, ইঙ্গিত, হাসি প্রভৃতি বাক্-চেষ্টা স্থগিত হইয়াছিল। আপন মনে আপন ভাবে বসিয়া থাকিতেন, কেহ কোন কথা বলিলে সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি বা মনোনিবেশ ঘটিত না। তাঁহাকে একটি বুদ্ধ-প্রতিমার মত দেখাইত। খাওয়ার সময় যতটুকু দরকার হাঁ করিয়া গ্রহণ করিতেন, তারপর মুখ বুজিয়া যাইত। মৌনাবস্থার কয়টি দিন বোধ হইতেছিল যেন বহির্জগতের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ৮।১০ দিন পরে অস্পষ্টভাবে ছু'একটি কথা বাহির হইতে লাগিল। তখন দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে মা যেন বাক্‌যন্ত্রাদি ও শরীরের ব্যবহার নূতন ভাবে আবার শিখিতেছেন। এরূপে তিনদিন যাইবার পর কথা স্বাভাবিক হয়। মার এইরূপ অবস্থা আমি ২।৩ বার দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সে সময়কার জড়বৎ প্রশান্ত মূর্ত্তি, সৌম্য দৃষ্টি ও উজ্জ্বল

মুখশ্রী দেখিলে ভক্তিশ্রদ্ধায় হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। অনিমেষ দৃষ্টিতে পর পর দেখিলেও প্রাণে তৃপ্তি আসে না। মা যখন প্রথম অবস্থায় ক্রমাগত তিন বৎসর মৌনী ছিলেন, তখন অনেকে তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়া বোবা মনে করিয়া দুঃখ করিতেন; বলিতেন—"বিধাতার কি বিচার! সকল গুণ দিয়াও এমন সুন্দরী বৌটিকে বোবা বানাইয়াছেন।"

মা বলেন—"মৌনী হবি তো মন-প্রাণকে একসঙ্গে একচিন্তায় ঘনীভূত করিয়া ভিতরে বাহিরে পাথরের মত হয়ে যা'। যদি কেবল বাক্‌সংযম করতে চাস্, সে স্বতন্ত্র কথা।"

শ্রীশ্রীমার যোগ-বিভূতির চারিখানি ছবি এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইল। প্রথম ছবির বিষয় এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছবিখানি দীর্ঘদিনের রোগশেষে তোলা হয়; তৃতীয় ও চতুর্থ ছবি তোলার সময় মা প্রথমতঃ সাধারণ ভাবেই বসিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অলৌকিক ভাবাদির স্বতঃই স্ফূর্তি পায়।

সমাধি ভাব

সাধনার চরম অবস্থা কিরূপ তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন স্তরের সাধন অবস্থার কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন ঃ—

চিত্ত-সমাধান কতকটা শুষ্ক কাষ্ঠে আগুন জ্বালানোর মত। ভিজা কাঠ হইতে জল শুকাইয়া গেলে যেমন ধক্ ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিতে থাকে, তদ্রূপ, উপাসনার ঐকান্তিকতায় বাসনা কামনার রস যখন চিত্ত হইতে কমিয়া যায় তখন চিত্ত হালকা হইয়া পড়ে। সেই অবস্থাকে চিত্ত সমাধান বা ভাবশুদ্ধি বলে। এরূপ অবস্থায় কাহারো ভাবোন্মাদনা (বিহ্বলতা, আবেশ প্রভৃতি) জন্মে। এক পরমার্থ সত্তার আশ্রয়ে ইহা বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগ উপলক্ষ করিয়া উদিত হয়।

ইঁহার পরের স্তরে **ভাব-সমাধান**। কেমন পোড়ানো কাঠকয়লা; একই সত্তার এক অখণ্ড ভাবের তন্ময়তায় শরীর অবশ হইয়া পড়িয়া থাকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধক জড়ভাবে কাটাইয়া দেয় অথচ অন্তরের গুহায় ভাবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ চলিতে থাকে। ইহার পরিপক্ক অবস্থায় কখনো কখনো এক সত্তার আশ্রয়ে একটি অখণ্ড ভাবের তরঙ্গ ভিতর বাহির একাকার করিয়া খেলিতে থাকে। ইহাকে **ভাব-সমাধান** বলে। যেমন একটি আধারে
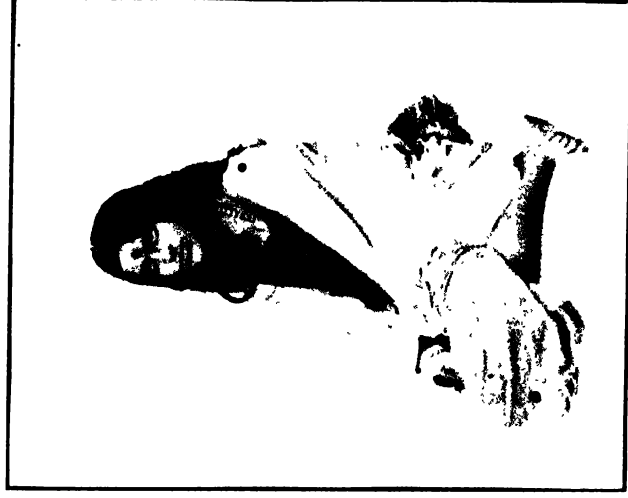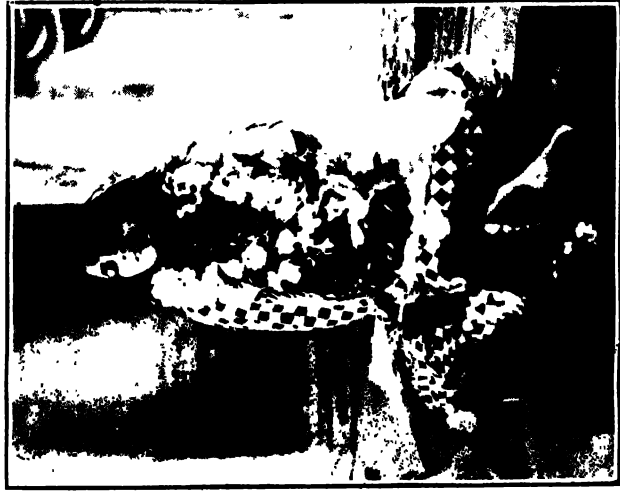
সমাধির আবেশে ও সমাধি অন্তে

[৬৮ পৃষ্ঠা

আয়তনের অধিক জল ঢালিতে গেলে তাহা পূর্ণ হইয়া অতি-রিক্ত জল উপছাইয়া পড়িয়া যায়, তেমনি এক অখণ্ড ভাবের দ্যোতনায় চিত্ত ছাপিয়া তাহার ভাববেগ বিশ্বময় বিরাট স্বরূপে বিগলিত হইয়া পড়ে।

তৃতীয় অবস্থার নাম **ব্যক্ত-সমাধান**। যেমন জ্বলন্ত কয়লাগুলি। ভিতরে বাহিরে একাকার অগ্নিদীপ্তি। জীব এই অবস্থায় এক সত্তাতে স্থির ভাবে বিরাজ করে।

পূর্ণ-সমাধান অবস্থায় সাধকের স্বগুণ নির্গুনের দ্বন্দ্ব চলিয়া যায়।

যেমন জ্বলন্ত কয়লার ভস্মের আগুন। সাধক এই অবস্থায় এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে স্থির হইয়া যায়। অন্তরে বাহিরে কোনও ভেদাভেদ থাকেনা,—"শান্তং শিবমদ্বৈতম্" অবস্থা। সকল ভাবের স্পন্দন এই অবস্থায় অস্তমিত হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের সমাধিভাব এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সৌভাগ্য বশতঃ সেই অবস্থা আমি অনেকবার দেখিয়াছি। এই প্রকারে কয়েকটি দৃশ্যের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কোনদিন হয়ত চলাফেরা করিতে করিতে, অতর্কিতে বা অনবহিতভাবে ঘরে আসিয়া বসিতেই, মা হাসিয়া হাসিয়া কাহারো সহিত কোন একটি কথা বলিতে বলিতে দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত, এবং লোকাতীত ভাবে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িত, তিনি ঢলিয়া পড়িয়া যাইতেন।

তখন দেখা যাইত, পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য্যের মতো

তাঁহার লৌকিক ভাব ও ব্যবহারাদি তিল তিল করিয়া কোথায় যেন অবসিত হইয়া যাইতেছে। ইহার পর দেখা যাইত শ্বাসের গতি মৃদু হইয়া পড়িতেছে, কখনো বা একেবারে স্থগিত হইয়া গিয়াছে, বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে, চোখ নিমীলিত। সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া পড়িয়াছে; কোন কোন দিন হাত পা কাঠের মত শক্ত, কখনো বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাপড়ের মত শিথিল, যে দিকেই ফিরানো যাইতেছে সেদিকেই গলিয়া পড়িয়া যাইতেছে।

মুখখানি প্রাণরসে রক্তাভ হইয়া উঠিত; গণ্ডদ্বয় দিব্য আনন্দের জ্যোতিতে সমুজ্জল—ললাটে এক বিমল প্রশান্ত স্নিগ্ধতা। দেহের সকল চেষ্টা তখন স্থগিত অথচ সর্ব্ব শরীরে লোপকূপ দিয়া যেন অপূর্ব্ব দীপ্তি স্ফুরিত হইতেছে। এই সময় সকলে মনে করিত মা সমাধির গভীরতায় ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছেন! এইভাবে ১০৷১২ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে তাঁহাকে জাগাইবার জন্য নানা চেষ্টা চলিত। কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হইত না।

আমি নিজেও মাকে জাগরিত করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। হাতে ও পদতলে জোরে ঘর্ষণ করিয়া আঘাত এবং ক্ষত করিয়াও কোন সাড়া পাইতে পারি নাই। সংজ্ঞা হইবার সময় হইলে আপনা আপনিই সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। বাহিরের ব্যাপারের উপর তাহা নির্ভর করিত না।

যখন মা সংসারের জ্ঞানভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন, শ্বাসের গতি আরম্ভ হইত, শ্বাস ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন ধীরে ধীরে সুরু হইত। একটু পরেই কোন কোন দিন আবার যেন অবশ, অসাড় হইয়া পড়িতেন, শরীর যেন জমিয়া গিয়া পূর্ব্বাবস্থায় যাইতে চাহিতেছে। চোখ খুলিলে অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতেন, আবার চোখ আপনা হইতেই বুজিয়া যাইত।

যখন সংজ্ঞা হওয়ার ধারাবাহিক লক্ষণাদ প্রকাশ পাইত তখন তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়া বসানো হইত, ডাকিয়া বাক্‌-স্ফূর্ত্তি করাইবার চেষ্টা চলিত। এই অবস্থাতেও সময় সময় দেখা যাইত তিনি বহির্জগতের আহ্বানে একটু সাড়া দিয়া আবার অন্তর্জগতে লীন হইয়া পড়িতেছেন। তখন প্রকৃতিস্থা হইতে তাঁহার বহুসময় লাগিত। শরীর খুব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিত।

একবার এমনও দেখিয়াছি সমাধির পরে তাঁহাকে অতি কষ্টে হাঁটানো হইয়াছে। সামান্য কিছু আহারাদিও মুখে দেওয়া গিয়াছে আবার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অসাড় ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া রহিয়াছেন।

সমাধির পর স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলেও সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের বিশেষ প্রকাশ দেখা যাইত। সংজ্ঞালাভের প্রাক্‌কালে কখনো হাসিতেন, কখনো কাঁদিতেন, কখনো বা যুগপৎ হাসি-কান্না দেখা দিত।

সমাধি অবস্থায় কোন কোন সময় মায়ের মুখখানি মৃতবৎ শীর্ণ, এবং শরীর দুর্ব্বল দেখা যাইত এবং মূর্ত্তিতে আনন্দ-নিরানন্দের কোন বহিঃপ্রকাশ থাকিত না। সে সকলদিনে দেখা গিয়াছে সমাধিভঙ্গ হইতে এবং শরীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে অনেক সময় লাগিয়াছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রম্‌না আশ্রমে আসিবার পরে সমাধিতে এরূপ মৃতবৎ অবস্থা অনেক সময় দেখা দিত; এক একবার সমাধিতে ৪৫ দিনও কাটিয়া যাইত। সমাধি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেহে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা যাইত না এবং এরূপ মৃতকল্প দেহে প্রাণের সঞ্চার হইতে পারে ইহা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না। দেহ শীতল হইয়া যাইত এবং প্রকৃতিস্থা হইবার বহুক্ষণ পরেও শরীর শীতল থাকিত।

সমাধিভঙ্গের পরে আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে মাকে কোন কোন দিন জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিতেন,—"সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ও ভাবের পূর্ণ সমাধানের নাম সমাধি—জ্ঞান, অজ্ঞানের অতীত অবস্থা। তোমরা যাকে সবিকল্প বল, তাও ঐ শেষ অবস্থায় পৌঁছিবার জন্য, উহাও সাধনা জানিবে। প্রথমতঃ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের যে কোন একটি তত্ত্ব, বস্তু বা বিচার উপলক্ষ হইয়া দাঁড়ায় সেইটিকে নিয়াই দেহটি জমিয়া যায়। তারপর এই লক্ষ্যটি সর্ব্বময় হইয়া অহং জ্ঞানকে ক্রমশঃ একে লয় করিয়া একই সত্বায় প্রতিষ্ঠিত করে। এরূপ অবস্থা যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখন ইহার

শেষ পরিণতিতে সেই এক সত্তাটিও কোথায় মিলাইয়া যায় এবং তখন কি থাকে বা না থাকে তাহা বুঝাইবার কোন ভাষা বা অনুভূতি আর থাকে না।"

কোন কোন সময় কোনও প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত মার শরীরে অপ্রাকৃত নানা লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কখনো দীর্ঘশ্বাস বহিত, সমস্ত শরীর মোড়ামোড়ি দিত, শরীর ক্রমে ক্রমে এদিক ওদিক বাঁকিয়া বাঁকিয়া যাইত, সে সময় হয়তো শুইয়া পড়িতেন, কখনো কখনো হাত-পা-মাথা গুটাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকিতেন। সে সময় সংজ্ঞা থাকিত; কিছু প্রশ্ন করিলে ধীরে ধীরে আবেশ জড়িতকণ্ঠে দু'একটি কথা বলিতেন।

এই অবস্থার কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে, যে—তাঁহার মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া এক সূক্ষ্ম প্রাণপ্রবাহ তিনি অনুভব করিতেন, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বাঙ্গে এমন কি রোমকূপে পর্য্যন্ত এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবের আলোড়ন বোধ করিতেন এবং মহানন্দের খেলায় শরীরের প্রতি অণুপরমাণু যেন নৃত্যশীলা হইয়া উঠিত। যাহা দেখিতেন যাহা স্পর্শ করিতেন সবই নিজের এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। শরীরের আর কোন ব্যবহার থাকিত না।

এই সময়ে মেরুদণ্ড ভালরূপে ঘর্ষণ করিয়া দিলে এবং দেহগ্রন্থিগুলি টিপিয়া দিলে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া

স্বাভাবিক ভাবে ফিরিয়া আসিতেন। এই অবস্থায় মা মূর্ত্তিমতী আনন্দরূপিণীরূপে প্রকাশিতা হইতেন, এবং তাঁহার কথায়, দৃষ্টিতে, ব্যবহারে প্রেমবিগলিত ভাবের দ্যোতনা থাকিত।

সাধারণ অবস্থার ভিতরেও কোন কোন দিন এমন দেখা গিয়াছে যে মা শুইয়া শুইয়া কথা বলিতেছেন, হাসিতেছেন, কিন্তু হাত পা খুব ঠাণ্ডা, হাতপায়ের নখগুলি নীল হইয়া গিয়াছে, অনেকে মিলিয়া হাত পা ঘষিতে ঘষিতে হাত পায়ের কঠিন ভাব কমাইতে পারে নাই; যাহারা হাত পা টিপিয়া দিতেছিল তাহাদের হাত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। একদিন এই অবস্থার পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে ১২ ঘণ্টা লাগে।

একদিন আশ্রমে সন্ধ্যা হইতেই মা সমাধিস্থা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। দিদিমা (মার গর্ভধারিণী) মার পাশে ঘরের মধ্যে শায়িতা। পিতাজীও ঘরের মধ্যে ছিলেন। রাত্রি তখন ২টা; আমি বারান্দায় বসিয়া মার চরণচিন্তা করিতেছি। হঠাৎ যেন প্রাণের ভিতর মার চলার ইঙ্গিত পাইলাম। কিন্তু চোখ মেলিতেই কিছু দেখিতে পাইলাম না। ঘরের ভিতরে কি যেন এক শব্দ হইল শুনিতে পাইলাম। আমি উঠিয়া যাইতে লণ্ঠনের আলোয় ঘরের দুয়ারে মার ছোট ছোট দুটি জলসিক্ত পায়ের ছাপ রহিয়াছে দেখিলাম।

ভিতরে গিয়া দেখি মা পূর্ব্ববৎ শয্যায় শায়িতা; দিদি-মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম মা বাহিরে গিয়াছিলেন কিনা। তিনি বলিলেন—"না, তোমার মা বাহিরে যান নাই।" রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে কিয়ৎক্ষণের জন্য মার সংজ্ঞা আসিয়া চলিয়া গেল। তার পরদিন মার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে ৩৷৪ দিন গেল।

এই সম্বন্ধে মাকে কিছুদিন পরে বলিলাম,—"শুনিয়াছি। সমাধি অবস্থায় অসাড় শরীর নিয়া চলাফেরা সম্ভব নয়, অথচ সে রাত্রে আপনার পায়ে ছাপ দেখিলাম কিরূপে?" মা বলিলেন—"বই পুস্তকে কি সকল কথা বুঝাইতে পারে?"

শ্রীশ্রীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধকের লক্ষণাদি কিরূপ?" মা বলিতে লাগিলেন—"যখন সাধক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা কতকটা উন্নত হয় তখন সে সাময়িক কখনো বালকবৎ, পিশাচ বা জড়বৎ, কখনো বা সাধারণ লৌকিক ভাবের উচ্ছ্বাসের ভিতর থাকে। কিন্তু এই সকল সাময়িক পরিবর্ত্তনের ভিতরও তার চিত্তের একমুখী গতি লক্ষ্যের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। এই অবস্থায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে তার সেইখানেই শেষ হয়।

"কর্ম্মবলে যে অগ্রসর হইতে থাকে তার সকল ব্যবহার ঐ এক লক্ষ্য আশ্রয়েই প্রকাশ পায়। প্রায় দেখিবি যে জড়বৎ

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে পড়িয়া আছে ; জাগ্রত অবস্থায় সকল ভাবেই সে যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্ত্তি। ক্রমশঃ আরো একটি সময় আসে যখন চলা ফেরা, শোওয়া বসা, সকল লোক-ব্যবহারে সে যেন এক মহা আনন্দের পুতুল—সে তখন ভিতরে বাহিরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ সত্তায় পরিণত হইয়া যায়।

"ইহার পর এমন এক অবস্থা আসে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার ঐক্যসত্তা সংস্কারটিও বিগলিত হইয়া য়ায়। তখন তাহাকে লৌকিক বুদ্ধি-বিচার দ্বারা ধরা যায় না। এইরূপ অবস্থায় তাহার দেহের সকল স্পন্দন স্থগিত হইয়া পড়ে এবং সে সময় তাহার দেহপাত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে কিন্তু জগতের জন্য যাহার জীবনের বিশেষ কল্যাণ-সংস্কার অবশিষ্ট থাকে সে এই অবস্থায় স্থিত থাকিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দেহ ধারণ করিতে পারে। সর্ব্বাবস্থায় তখন সে অপরিবর্ত্তিত থাকে। দেহধারী বলিয়া আমরা তাহাকে দেহীর মত পরিবর্ত্তনশীল মনে করি মাত্র।

"যোগবলে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহাদের সহিত উপরোক্ত অবস্থাপন্ন সাধকের তফাৎ এই যে যোগীদিগের স্বইচ্ছায় প্রাণবায়ুর অন্তর্ধান হইয়া থাকে। দেহ ছাড়িবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের দেহসত্তাবোধ বা দেহসংস্কার থাকে বলিয়া তাহারা ক্রিয়াধীন থাকে। যাহাদের মহাযোগ বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দেহপাত হয়, তাহাদের স্বকৃত কোন

ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনসঞ্চিত কর্ম্ম-ফলের অবসানে তাহাদের দেহপাত আপনা আপনিই ঘটিয়া যায়। তাহাদের জন্মমৃত্যুর কোন সংস্কার থাকেই না।”

শ্রীশ্রীমা আর একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

(১) স্ব স্ব ভাবানুযায়ী একনিষ্ঠ ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে।

(২) তার পরে একনিষ্ঠ ভাবের সাধনায় খণ্ড খণ্ড ভাব-গুলি একসূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়।

(৩) পরে খণ্ড খণ্ড ভাবধারা এক লক্ষ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে ; সাধক ভিতরে বাহিরে জড়বৎ হইয়া পড়েন।

(৪) তাহার পরে একসত্তার আশ্রয়ে একটি অখণ্ডভাবে সাধক স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মা সকল সময় এসব কথা বলেন না, কিংবা কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ চুপ হইয়া পড়েন। সর্ব্বদা বহুভক্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকেন। ঐ সময় ভক্তদের কল্যাণের জন্য যখন যাহা বলেন তাহা লিপিবদ্ধ করাও সম্ভব হয় না। অনেক বিষয় সকলের বোধগম্যও নহে।

শ্রীশ্রীমা এমন সার্ব্বজনীনভাবে উপদেশাদি দেন, অনেক সময় তাহার যথাযথ মর্ম্ম আমাদের মত লোকের ধারণায় আসে না। তবুও তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত পাবনভাবধারা যখন যার হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে তখন সে তাহার নিজ

নিজ ভাব বা সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝে তাহাই প্রকাশ করে। হিমালয়ের অনন্ত জলরাশি কত ছোট বড় প্রস্রবণ ও নদীপথে প্রবাহিত হইয়া কত উষর ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে তাহার ধারণা হওয়া সহজ নয়। এই অজস্র প্রবহমান জলধারায় হিমালয়ের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। কিন্তু তাহার দ্বারা জগতের কল্যাণ অহরহ সাধিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শে, ঈঙ্গিতে, কথায়, হাসিতে আমাদের জীবনের তিল তিল যে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের নিত্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যে তাঁহার আশীষ কিভাবে কার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছে সে সব কথা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমায়ের মহিমাকে খর্ব্ব করা হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। তাহা দ্বারা বরং তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয় এবং উহা আমাদিগকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়।

লীলা-খেলা

শ্রীশ্রীমার চিরজ্যোতির্ম্ময়ী হাস্যমুখর মূর্ত্তি, শিশুর মতো সরল ভাব, আবদার, নানা হাস্য-কৌতুক, তাঁহার পরিপূর্ণ হৃদয়ের অবাধগতি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার কথায়, তাঁহার দৃষ্টিতে, তাঁহার প্রত্যেক ভাবভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি মধুরতা রহিয়াছে যে তাহার তুলনা নাই। তাঁহার শরীর হইতে, প্রত্যেক শ্বাস হইতে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র বা শয্যা হইতে পবিত্রতার ঐ দিব্য গন্ধ সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। তাঁহার গানের সুরে প্রাণের পবিত্র ভাবরাশি নির্ঝরের স্রোতের মতো উৎসরিত হয়।

তিনি নিজে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, উদাসীন; নীলিম আকাশের মতো নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া সকলকে বুকের মধ্যে টানিয়া নিতেছেন। তিনি সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির. মানুষ, পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির মধ্যে একই অখণ্ড প্রাণের লীলা দেখিতে পাইয়া সকলকে একই আনন্দের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন, সকলের প্রতি সমানভাবে অনুরাগ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

মা বলেন—"নূতন করিয়া আমার কিছু দেখিবার বা শুনিবার বা বলিবার নাই।" অথচ কোন সামান্য সামান্য বস্তু লইয়া এমনভাবে মাতিয়া যান যে মনে হইবে যেন শিশুর হাতে পুতুল পড়িয়াছে।

ভক্তদের লইয়া কত ক্রীড়া কৌতুক মার দেখিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার সকলের ইচ্ছা হইল শ্রীশ্রীমাকে বালক কৃষ্ণরূপে সবাই দেখিবেন। আবার কিশোর কৃষ্ণরূপে মাকে সাজাইবেন। মাকে সকলে মিলিয়া তেমন করিয়া সাজানো হইল। তাঁহার এই দুই অবস্থার ছবি এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। একই মা দুইভাবে কত সুন্দর সজ্জিতা হইয়াছেন। বালভাব ও কিশোরভাবে তাঁহার মুখশ্রী অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টিব স্নিগ্ধতা, ললাটের প্রশান্ত ঔদার্য্য, মুখের পবিত্র কমনীয়তা, দেহ ভঙ্গীর নমনীয়তা কোন্ গোপন উৎস হইতে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তিখানিকে দৈবী প্রভাবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহা কেবল অসাধারণ নহে, অলৌকিক, অভূতপূর্ব্ব বলিয়াই মনে হয়।

বালক কৃষ্ণরূপে শ্রীশ্রীমায়ের হাসির একখানি ছবিও এই অধ্যায়ে দেওয়া গেল। তাঁহার হাসিতে যেন শরীরেব প্রতি অণুপরমাণু হাসিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়; হাসির আড়ালে পবিত্রতার এক অপূর্ব্ব জ্যোতি মায়ের মূর্ত্তিকে কত ওজস্বী করিয়া তুলিয়াছে ভক্তজন তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন। এমন পবিত্র হাসি কোন মানুষ হাসিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না।

যেখানে শ্রীশ্রীমা বিরাজ করেন সেখানে ভক্তদের বিবিধ ভাব হিল্লোলের উপর এক অপরূপ মাধুর্য্য ফুটিয়া ওঠে।

বালক কৃষ্ণবেশে হাস্যরতা মা [৮০ পৃষ্ঠা

যার ভাব যেরূপ সেভাবের মধ্যেও সে অপূর্ব্ব নির্ম্মলতা অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা বালকভাবে দেখিয়া অভিভূত হইতেন, শ্রীদাম সুদামের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ভাবের মধুরতা ফুটিয়া উঠিত, গোপিনীগণ কান্ত ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, তেমনি শ্রীশ্রীমা ভক্তজনের ভাবানুযায়ী অপরূপ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

শিশু বয়স হইতে মার এই প্রাণের খেলা চলিয়াছে। তাঁহার সঙ্গ না পাইলে তাঁহার সমবয়সীদের আনন্দ হইত না। পরবর্ত্তী জীবনেও কি বালক, বৃদ্ধ, কি যুবা, তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শ একবার পাইলে তাহারা কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"আবার করে দেখা হইবে?" •মা যখন যেখানে থাকেন তখন সেখানে আনন্দ-বাজার বসিয়া যায়, কেমন এক অভিনব ভাবের উদ্দীপনায় শতসহস্র লোক সজীব হইয়া উঠে তালে তালে যেন নাচিয়া ছুটে। আবার যখনি কোন স্থান হইতে চলিয়া যান, তখন তাহা মহাশূন্যে পরিণত হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে কখনো কখনো মায়ের রুক্ষ আলু থালু চুল, এলো মেলো বেশ ও চলাফেরা লক্ষ্য করিয়া ভয়ে ভয়ে কেহ কেহ তাঁকে পাগল বলিয়া দূরে সরিবার চেষ্টা করিয়াছে, অথচ তাঁহার নিকট হইতে চোখ ফিরাইয়া নিতে পারে নাই।

সাধারণ হাসি-খেলার ভিতর দিয়া তাঁহার কত অসাধারণ শক্তি অহরহ প্রকাশ পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শ্রীশ্রীমাকে এ সব বিষয়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে মা বলেন,—"সাধারণ অসাধারণ তোদের কাছে, আমি সকল সময়, সকল অবস্থায় একভাবেই রহিয়াছি।" আরো বলেন— "সবইতো খেলা, তোদের খেলার সাধ আছে বলিয়াই হাসি তামাসাতেও এই শরীরটাকে তোরা টানিয়া লইয়া যাস্। যদি ইহা স্থির ধীর গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিত, তবে তোরা যে দূরে স'রে থাক্‌তিস্। বেশ সুন্দর করিয়া আনন্দের খেলা খেল্‌তে শিখ্। তা হলে খেলার ভিতর দিয়াই খেলার চরম পাবি—বুঝ্‌লি!"

যাহা সাধারণের নিত্য দিনের অভিজ্ঞতার অতীত, তাহাই তাহার পক্ষে অসাধারণ; কিন্তু যিনি নানা ভাবকে একই ভাবে অবসিত করিয়া অদ্বৈত আত্মানন্দ রসে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কখনো জীব-ভাব, কখনো ঈশ্বর-ভাব, কখনো ব্রহ্ম-ভাব এই সব স্বতঃ স্ফূর্ত্ত বিভূতি খেলা ছাড়া আর কি বলা যায়? মায়ের স্বকীয় কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এ শরীরে দেখা যায় না। কখনো বা ভক্তদের সদ্‌বুদ্ধি ও শুদ্ধভাবের প্রণোদনের জন্য নানারূপ অলৌকিক প্রকাশাদি হইয়া থাকে, কখনো বা শ্রদ্ধালুর ঐকান্তিক কামনাই মাতাজীর সরল ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে। মা বলেন—"এই শরীর ত একটি ঢোল তোরা যে তালে বাজাবি সেরূপ আওয়াজ পাবি। আমি ত দেখতে পাই সর্ব্বত্রই একই খেলা চলিয়াছে।"

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যেদিন মা ঢাকা ত্যাগ করিয়া আসেন, তার পূর্ব্বদিন বেলা ৫টার সময় রম্না আশ্রমের ভিতর বহু স্ত্রী ছেলে ও মেয়ে প্রসাদ নিতে বসিয়াছে, তাদের সঙ্গে মাও বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া গেল, ঝড় উঠে উঠে দেখিয়া সকলেই বৃষ্টির আশঙ্কা করিতেছিল। এমন সময় অপর একটি নূতন দলও আসিয়া খাইতে বসিল। যাহাদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, মা তাহাদের উঠিতে বলিয়া নিজেই সেখানে বসিয়া রহিলেন। সকলের যখন খাওয়া শেষ হইল, মা বলিলেন,—"আমি স্নান করিব।" সন্ধ্যাবেলাতে স্নান করিতে অনেকে বাধা দিল, কিন্তু মা তো কিছুতেই ভুলিবার নন। কথা কাটাকাটি চলিতেছে এমন সময় খুব বৃষ্টি সুরু হইল; বৃষ্টির জলে সমস্ত উঠান ভরিয়া গেল। মা এই জল ও বৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা, যুবা-বৃদ্ধ তাদের সাজ-গোজ পোষাক-পরিচ্ছদসহ মহানন্দে যোগ দিল ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। রাত্রি ৯টার সময় সকলে বাড়ী ফিরিল। ইহাদের ভিতর কেহ কেহ অসুস্থও ছিল, কিন্তু কাহারো কোন অসুখ হয় নাই।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে মা হাসিতে হাসিতে ঝড়, বৃষ্টিপাত, দ্বন্দ্ব, কলহ দৃষ্টিপাতেই থামাইয়া দিয়াছেন।

মা স্বভাবতঃই অল্পাহারী; এত অল্পাহারী যে কল্পনায়ও আসে না। শরীরের উপর দিয়া যখন নানা ক্রিয়াদি প্রকাশ পাইত, তখন মা কতদিন নিরম্বু উপবাসেও কাটাইয়াছেন। শুনিয়াছি সে সব ক্রিয়াদি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার খাওয়ার খেয়ালই আসিত না। যখন তিনি স্বল্পাহারে বা অনাহারে থাকেন, তাঁর মুখশ্রী উজ্জ্বল, শরীর সুস্থ ও চিত্তের প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। স্বল্পাহারের বিভিন্ন বিধান তাঁহার ভিতর পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। রাত্রিশেষে প্রতিদিন সামান্য কিছু খাইয়া তিনি ৫ মাস কাটাইয়াছিলেন; সব কিছু মিলাইয়া দিনে তিন গ্রাস ও রাত্রে তিন গ্রাস অন্ন খাইয়া তিনি ৮।৯ মাস ছিলেন। ৫।৬ মাস খুব সামান্য জল ও ফল দিনে দুই-বার মাত্র গ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন; সপ্তাহে দুই দিন, দিনে রাত্রে দুইবার মাত্র সামান্য অন্নাহার করিয়া অবশিষ্ট কয়দিন খুব সামান্য ফল খাইতেন। এরূপে ৬।৭ মাস কাটিয়াছে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে খাদ্যাদি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। মুখের কাছে হাত নিলেই হাত খুলিয়া সব পড়িয়া যাইত। হাতের কোন পীড়া ইহার কারণ নয়। সে সময় আর এক নূতন ব্যবস্থা হইল; যে খাওয়াইত তাহার দুই আঙুল দিয়া যতটুকু অন্ন উঠিত, ঐটুকু দিনে একবার, রাত্রে একবার খাইয়া ৪।৫ মাস কাটাইলেন। তখন একদিন

কিশোর কৃষ্ণবেশে মা [৮৪ পৃষ্ঠা

পরে একবার মাত্র সামান্য জল পান্ করিতেন। ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত সকালে তিনটি ভাত, রাত্রে তিনটি ভাত এবং গাছতলায় ঝড়ে পড়া ২।১টি ফল খাইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কোন সময় অন্ন ঠোঁটে ছোয়াইয়াও ফেলিয়া দিতেন। আবার এমনও হইয়াছিল যে একজন একশ্বাসে জল ও অন্নাদি যতটুকু খাওয়াইতে পারিত মা তাহা খাইয়া দিনের পর দিন ২।৩ মাস কাটাইয়াছেন। যজ্ঞাগ্নিতে একটি ছোট কৌটাতে করিয়া চাল ডাল মিলাইয়া এক ছটাক মাত্র সিদ্ধ করিয়া খাইতেন, এরূপে ৮।৯ মাস কাটাইয়া দিয়াছেন। আবার শাক-সব্জী সিদ্ধ যুষসহ অন্ন বা সামান্য পরিমাণ দুধ বা ২।১ খানি রুটি খাইয়া তাঁহার বহুদিন গিয়াছে। অনেক সময় তিনি না খাইয়াও কাটাইয়াছেন।

ভাত খাওয়া যখন একরকম বন্ধ হইল তখন ভাতও চিনিতে পারিতেন না। এক কাঁহার চাকরাণী শাহিবাগে ছিল, সে খাইতে বসিয়াছে; তাহার খাওয়া দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"এ কি খাইতেছে, কি সুন্দর ভাবে মুখে দিতেছে, চিবাইতেছে ও খাইতেছে—আমিও খাব", এই বলিয়া তার পাতের কাছে যাইয়া বসিলেন। একদিন এক কুকুর ভাত খাইতেছে, সেখানে গিয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে "আমি খাব, আমি খাব" বলিতে লাগিলেন। উপরোক্ত ভাবাদিতে বাধা পাইলে দেখা

যাইত ছেলেমানুষের মত মাটিতে পড়িয়া অনেক সময় কাটাইয়া দিতেন। শেষে মা নিজেই একদিন বলিলেন—"মানুষে ত্যাগের চেষ্টা করে, আমার কিন্তু সবই বিপরীত; আমি যাতে ত্যাগ না হয় তার ব্যবস্থা করি। তোমরা স্মরণ করিয়া রোজ তিনটি ভাত আমায় খাওয়াবে, তা না হইলে হাতে না খাওয়ার মত ভাত খাওয়াও বন্ধ হইয়া যাইবে।"

যাহারা মাকে খাওয়াইত তাহাদের সতর্ক থাকিতে হইত যে, যাহাতে তাঁকে এক কণাও অতিরিক্ত খাওয়ান না হয়। খুব শুদ্ধ সংযত হইয়া খাওয়াইতে হইত এবং খাবার বাসন ও দ্রব্যাদি পরিষ্কার রাখা দরকার হইত। নতুবা হয়ত মা গিলিতে পারিতেন না, না হয় মুখ আপনা আপনিই ফিরিয়া যাইত, না হয় শরীর আসন হইতে উঠিয়া আসিত। মা বলিতেন—"এ শরীরে আর মাটিতে কোন তফাৎ নাই; আমি ত মাটিতে বা যে কোন স্থানের উপর রাখিয়া যে ভাবে যা দাও তাই খাইতে পারি; তোমাদের শিক্ষার জন্য, আচার, নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা, কর্ত্তব্যপালন ইত্যাদি আবশ্যক, তাই আমার এরূপ হয়।"

দীর্ঘকাল এরূপ অল্পাহারের অবস্থাতেও সাংসারিক গৃহ-কর্ম্মাদিতে তাঁহাকে তিলমাত্র ক্লান্ত বা অবসন্ন দেখায় নাই। পরে আস্তে আস্তে সকল কর্ম্মাদি যেন আপনা হইতেই ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, রান্না বা কোন কাজ করিতে গিয়া

সেখানেই অবশ ভাবে পড়িয়া থাকিতেন। কোন কোন দিন আগুনের তাপে হাত পা পুড়িয়া যাইত, কোন দিন অন্যরূপ ব্যথা পাইতেন, কিন্তু সে সব দুর্ঘটনা তাহার অনুভূতিতে কিছুই আসিত না। মা বলেন—"কাহাকেও কিছু ইচ্ছা করিয়া ছাড়িতে হয় না, কর্ম্মের পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ আপনা হইতে হইয়া যায়।"

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে আহারের কঠিন নিয়মাদি শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু যাহাই খাইতেন, খুবই সামান্য ; উহাকে শিশুর আহার বলিলেও চলে। হাতে খাওয়া বন্ধ হওয়ার ৪।৫ বৎসর পরে মা নিজ হাতে খাইবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিলে মারও একবার তদনুরূপ খেয়াল হইল। খাওয়ার দ্রব্যাদি নিয়া বসিলেন, একটু মুখে দেন, বাকীটা বিলাইয়া দেন বা মাটিতে লেপিয়া দেন—খাওয়া মোটেই হইল না। ইহার পর হইতে আর নিজ হাতে খাইবার জন্য কেহ আবদার করে নাই। মা বলেন—"আমি দেখি সবই আমার হাত, আমার হাতেই খাই।"

শ্রীশ্রীমায়ের ঘরকন্নার, রন্ধনাদির পারিপাট্যতা ও পবিত্রতা এবং পরিবেষণে আদর অভ্যর্থনার নির্ম্মল প্রসন্নতা অল্প বয়স হইতে দেখা গিয়াছে। যখন যা' করিতেন সবই গুছানো ও নিখুঁত। তাঁতে কাপড় বোনা, সেলাই, উলের কাজ, বেতের কাজ প্রভৃতি নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া অতি সুন্দর ভাবে করিতে পারিতেন। হয়ত কোন কাজ অন্যেরা চেষ্টা দ্বারা যাহা

পারিতেছে না তিনি অতি সহজেই তাহা করিয়া দিতেন। সকলে এসব দেখিয়া অবাক হইত। তাঁহার রান্না ডাল তরকারীর স্বাদ অতি অপূর্ব্ব হইত ; এজন্য নিমন্ত্রের পাকেও আবদার অনুরোধে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইত।

ছোট বড় সকলকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মা বড় আনন্দ পাইতেন ; নিজে না খাইয়া, না পরিয়া অপরকে তৃপ্তি দিতেন। একদা গুজরাট অঞ্চলের এক সাধু শাহবাগে উপস্থিত হন। মা নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাঁহার আসনাদি মুছিয়া দিলেন এবং বিনয় মধুর ব্যবহারে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। খাবারের থালাটি এমন ভাবে সাজানো হইয়াছিল যে বোধ হইতেছিল যেন খাদ্য দ্রব্যাদি শ্রদ্ধা ও সেবার স্পর্শে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। সে মহাত্মা বলিয়াছিলেন:—"আজ ত জগজ্জননীর হাতে খাইলাম, এমন যত্ন করিয়া কেহ খাওয়ায় নাই।"

যতদিন তিনি পারিয়াছেন নিজ হাতে রান্না করিয়া গৃহস্থ জননীর মত সন্তানদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। তাঁর হাতের প্রসাদ অনেকের প্রাণে অভাবনীয় আনন্দ সঞ্চারিত করিত। অনেক সময় প্রসাদাদি বিতরণেও অনেক অলৌকিক ঘটনা পরিলক্ষিত হইত। একদিন ৺নিরঞ্জনের স্ত্রী কতকগুলি কমলা নিয়া গেলেন। মা উঠিয়া প্রত্যেকের হাতে এক একটি দিতে লাগিলেন কারণ সকলেই বলে—"মার হাতে নেবো।" লোকের সংখ্যা দেখিয়া কমলা কম পড়িবার

আশঙ্কা হইতেছিল। কিন্তু মার এমনই লীলা যে একেবারে সমান সমান হইয়া গেল। একবার ৺নিরঞ্জনের বাড়ীতে কীর্ত্তনে ৫০।৬০টি লোকের মত প্রসাদের আয়োজন হয়, কিন্তু প্রায় ১২০ জন উপস্থিত হইল। মা শুনিয়া যেখানে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ছিল, সে কামরার এক কোণায় সকলের প্রসাদ নেওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে দেখা গেল তবুও কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আশ্রমে কত খাবার ও বস্ত্রাদি মার উপলক্ষে আসিত! নিজে একটুখানি গ্রহণ করিয়া বা কাপড়খানি একবার পরিয়া বা গায়ে ছোঁয়াইয়া বিলাইয়া দিয়া আহ্লাদে প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন। অনেকে বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যাদির গহনা ও অন্যান্য জিনিষাদি মাকে নিবেদন করিয়াছে। অনেক সময় শাঁখা, কাঁচের চুড়ি ও সোণার গহনাদিতে মার দুই হাত ভরিয়া যাইত। তিনি সবই সমভাবে গ্রহণ করিতেন—কে কি দিল, বা কে কি নিল বা রাখিয়া দিল তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গহনাদি কিছু বিতরণ করা হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রায় হাজার টাকার সোণা রূপা গলাইয়া আশ্রমের দেবমূর্ত্তি উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের পরিবার মাত্র দুইখানি কাপড় থাকিত। তাহা হইতেও অনেক সময় এক-খানি দিয়া ফেলিতেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে দিতে না দিতেই আবার বাহির হইতে আসিয়া পড়িত।

আমি ঢাকা হইতে কলিকাতা গেলে আমার জ্যেষ্ঠ প্রতিম

শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেনের বাসায় থাকিতাম। তাঁহার স্ত্রী ৺হিরন্ময়ী দেবী আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন। এমন স্নেহশীলা, লোক-রঞ্জনে সিদ্ধহস্তা, সরলা শুদ্ধা পতি-প্রাণা মহিলা খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার ভাবে আকৃষ্ট হইয়া মাও মাঝে মাঝে আপনা হইতে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একবার মা কলিকাতায় কালীঘাটে এক বাসায় উঠিয়াছেন; আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি, ঠিক সে সময় একজন ভক্ত মাকে ভালো একখানি ঢাকাই শাড়ী পরাইয়া দিলেন। মার তখন জ্ঞানবাবুর বাসায় যাইবার কথা। তাঁহারা পথে অন্য কোন স্থানে যাইবেন শুনিয়া আমি আগেই চলিয়া আসিলাম। বাসায় ফিরিয়া মাঝারি রকমের একখানি শাড়ী কিনিয়া আনিয়া মার জন্য রাখিয়া দিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম মা আসিলে এটি তাঁকে পরাইলে ঢাকাই শাড়ীখানি জ্ঞানবাবুর স্ত্রী পাইবেন। এ সম্বন্ধে কাহাকেও জানাইলাম না। মা আসিলেন; কিন্তু দেখি কি মার পরণে একখানি সামান্য কাপড়। মা আসিবার পথে যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে ভাল শাড়ীখানি দিয়া আসিয়াছেন। আমি অবাক হইলাম। মা আমার দিকে তাকান আর হাসেন। কেহ কিছু বোঝে না। অবশেষে আমার বুদ্ধির দৌড়ের কথা খুলিয়া বলিলাম।

উপরে যেরূপ অল্পাহারের অলৌকিক ব্যাপারাদি লিপি করিয়াছি সেরূপ আবার কয়েকটি অত্যাহারের ঘটনাও

দেখিয়াছি। ৮।৯ মাস যজ্ঞাগ্নি পাকে এক ছটাক অন্ন গ্রহণের পর যে দিন মা প্রথম সাধারণ ভাবে অন্ন গ্রহণ করেন; সেদিন সকলের আবদারে তাঁহাকে একা ৮।৯ জনের পরিমাণ আহার্য্য খাওয়াইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। একবার হাসি খেলা করিতে করিতে ৬০।৭০ খানি লুচি, তদনুযায়ী ডাল তরকারী ও এক বাটি মিষ্টান্ন খাইয়া ফেলিলেন। আর এক বার প্রায় আধমণ দুধের মিষ্টান্ন খাইলেন, পরে 'আরো খাবো', 'আরো চাই' বলিয়া ছোট বালিকার মত ইচ্ছাপ্রকাশ ও আবদার করিয়াছিলেন।

লোকের দৃষ্টি দোষে পাছে মায়ের পেটের অসুখ হয় এই আশঙ্কায় লোকাচারের বশে হাঁড়ি মুছিয়া আনিয়া কয়েক ফোঁটা মিষ্টান্ন আনিয়া মায়ের মাথার কাপড়ের উপর সে সময় ছিটাইয়া দেওয়া হয়। পরে দেখা গেল সে সে স্থান আগুনে পোড়ার মত হইয়া গিয়াছে।

এরূপ আহারাদির সময়, এবং কখনো কখনো পরেও কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত একটি অপ্রাকৃত ভাব দেখা যাইত। মা বলিয়াছেন—"আমি যে বেশী খাইয়াছি তোমাদের মুখেই শুনিলাম, খাইবার সময় আমি তা' বুঝি নাই। সে সময় ভাল জিনিষ কেন, ঘাস পাতা যাহাই যত ইচ্ছা দাও না কেন একই ভাবে খাইতে পারি।" শরীরের কোন অসুস্থাবস্থা ইহাতে জন্মাইত না। দেখা যাইত যে শুধু খাওয়ানো কেন অন্যান্য কোন কর্ম্মাদি যাহা খেয়ালে আসিত তাহা করিয়া

যাইতেন। তাহা অস্বাভাবিক হইলেও সে সে কর্ম্মাদির ফলে কোন বৈগুণ্য দেখা যাইত না।

যেমন দেবতার পূজার উপচার গুলিতে গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পরে নিবেদন করিতে হয়, সেরূপ মাতৃচরণে দ্রব্যাদি ঐকান্তিক ভাবের দ্বারা যে যত প্রাণময় করিয়া অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছে, সে তত আনন্দলাভ করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি তিনি সামান্য মুড়ি, খৈ বা বাজে ফল, মিষ্টি খুব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিতেন। তরকারীতে হয়তঃ নূন মোটেই নাই, মিষ্টান্নে হয়তঃ চিনিই পড়ে নাই, সেগুলি হাসিয়া খেলিয়া যাহা দিতেছে তাহাই ভালমন্দ অবিচারে খাইতেছেন এবং "শীগ্‌গির খাইয়া দেখ, কেমন জিনিষ" এ বলিয়া অন্যকে ডাকিয়া দিতেছেন। আবার কাহারও কাহারও বহুকষ্টে সংগৃহীত মূল্যবান্ দ্রব্যাদিও একটু মুখে দিয়াই মুখ বন্ধ করিতেন।

ঢাকা গেণ্ডারিয়ার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টার ৺ তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শেষ বয়সে আপনার ঘরের দুধের ছানার সন্দেশ তৈয়ারি করিয়া ৪।৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া এক দিন খুব ভোরে স্বআশ্রমে আসিলেন। মা তখনো বিছানা হইতে উঠেন নাই। বৃদ্ধ আসিয়া মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, আর বলিলেন, "আমি অতি পবিত্র ভাবে তোমার জন্য সন্দেশ আনিয়াছি খেতে হবে মা।" মা হাতমুখ না ধুইয়াই বিছানায় বসিয়া বৃদ্ধের হাতে শিশুর মত সন্দেশ

খাইতে খাইতে হাত তালি দিতে লাগিলেন। তারকবাবুর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। একদিন বেবী মধ্যাহ্নে বাড়ী হইতে মার জন্য মিষ্টসামগ্রী তৈয়ারী করিয়া আশ্রমে আসিতেছিলেন। মা আশ্রমে সকলের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন। বেবী তখনো প্রায় আধ মাইল দূরে। মা হঠাৎ হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,—"আমার খাবার আসিতেছে"। এবং ছেলে পিলের মত খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া গুছাইয়া বসিলেন। কোন কোন দিন কেউ ঘরে না আসিতেই মা শিশুর মত আবদার করিয়া বলিয়া উঠিতেন—"আমার জন্য কি এনেছো, শীঘ্র বাহির কর" এবং তাহাকে নিয়া কত হাসি তামাসা করিলেন। আবার এমনও দেখা গিয়াছে কেউ খাবার নিয়া বসিয়াই আছে,—মার ঘুমই ভাঙ্গে না।

আমি রোগে শয্যাশায়ী। হঠাৎ মনে হইল মাঁর জন্য কিছু ক্ষীর পাঠাইয়া দি। ক্ষীর তৈয়ারী হইলে, আমি আল্‌গা ভাবে এক ফোঁটা মুখে দিয়া দেখিলাম, ভাল হইয়াছে কিনা। আমার বড়দিদি তখন নিকটে ছিলেন, বলিলেন—"এই ক্ষীর মার কাছে পাঠানো যায় না। খাওয়া জিনিষ দেবতার ভোগে লাগে না।" আমি বললাম—"উহা পাঠাইয়া দাও।" শুনিলাম সব ক্ষীর সেদিন মা একাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর একদিনের কথা। আমি বলিলাম, "আজ মার নিকট রুটির পালো তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়া দাও।"

বাড়ীতে সবাই অনিচ্ছার সহিত উহা পাঠাইয়া দিয়াছিল.; শেষে শোনা গেল; মা তাহার একটুকুও গ্রহণ করেন নাই।

এমনও দেখা গিয়াছে যে কেহ শূন্য হাতে আসিয়া মায়ের বহুদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে ভাব উপহার দিতেছে, সে মায়ের কৃপা মর্ম্মে মর্ম্মে যত অনুভব করিয়াছে, ভোগাদি সহকারে কাতরতা বা অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াও অনেকে মায়ের সেরূপ উপদেশ বা করুণা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। যার যেরূপ ভাব সেইরূপই লাভ হইয়াছে; বাহিরের কোন দ্রব্যাদি আদানপ্রদানের অপেক্ষা রাখে নাই।

মার নিকট আস্তিক-নাস্তিক ধনী-দরিদ্র, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী কিংবা পুরুষ সকলেরই সকল সময় অবারিত দ্বার। মা হাসিতে হাসিতে অনেক সময় বলেন—"আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় জানতে চাও কেন? দেখনা আমার দুয়ার সর্ব্বক্ষণ খোলা। তোমরা বরং তোমাদের সংসারের খেয়ালে এ মেয়েটির কথা মনে রাখনা; জানিও তোমাদের কথা আমার সর্ব্বক্ষণ মনে থাকে।" যিনি না দেখিয়াও দেখিতে পান, আবার দেখিয়াও দেখেন না, না শুনিয়াও শুনিতে পান আবার শুনিয়াও শুনেন না, তাঁহার পক্ষে ইহা আর বিচিত্র কি? দিন-রাত্রি, সুখ-অসুখ, ক্লান্তি-অক্লান্তি অবিচ্ছেদে মা যেন সকলেরই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

প্রত্যহ লোকজন প্রায় সব সময়, বিশেষতঃ সকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লাগা থাকে। কেউ হয়ত সিঁদুর

পরাইতেছে, কেউ বা হয়ত চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে, কেউ হয়ত বলিতেছে চল যাই স্নান করাইয়া দিব; কেউ হয়ত বলিতেছে, "দাঁত মাজিয়া দিব, চল," কেউ হয়ত কাপড় পরাইয়া দিতেছে, কেউ জামা বদলাইয়া নিতেছে, কেউ হয়ত মুখে এক টুকরা মিষ্টি বা ফল দিতেছে, কেউ হয়ত বলিতেছে মা, একটি গান কর, কেউ হয়ত কাণে কাণে কিছু বলিতেছে, আবার কেউ হয়ত সে আসন হইতে অন্যত্র গিয়া নিজের গোপন কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে, আবার কেউ আসিয়া বলিতেছে,—"সর, সর, মাকে ঐ রকম ভাবে বিরক্ত করো না।" এরূপ অবিরাম নানা অনুরোধ আব্‌দার এবং শত শত লোক কোলাহলের ভিতর মা অচল অটল ভাবে একই আসনে প্রসন্ন বদনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, আর চারিদিকে আনন্দের ঢেউ উছলিয়া পড়িতে থাকে। সকলে সমান ভাবে আকৃষ্ট না হইলেও মাতাজীর স্নেহমধুর করুণ দৃষ্টি প্রত্যেকের উপর উষার স্বর্ণালোকের মতো একই ধারায় পতিত হয়। কাহাকে কোন দিন হতাশ বা মলিন বদনে ফিরিতে দেখা যায় নাই। মা বলেন—"বুঝ অবুঝ নিয়াইতো ভগবানের সংসার, যার যেমন খেল্‌না দরকার, তাকে তাই দিয়ে শান্ত রাখ্‌তে হয়।" এইসব কারণে কেহ কোন দিন বলিতে পারে নাই যে "মা আমার নয়, তোমার।" যাঁহারাই নিবিড়ভাবে জননীর সঙ্গ লাভ করিয়াছে, প্রত্যেকেই মনে করিয়াছে, "মা, যে একান্তই আমার।" সকলেই

প্রাণের অন্তরতম আবেগ তাঁহার নিকট সাগ্রহে নিঃসঙ্কোচে খুলিয়া দিয়া তাঁহার অভয় বাণী লাভে সন্তুষ্ট হইয়াছে।

মা নিজেও ভক্তদের নিয়া কত খেলা খেলিয়া থাকেন, তাহা বোধগম্য করা আমাদের শক্তির অতীত। কাহারো পুত্রের জন্মোৎসব বা কাহারো পুত্রশোক এ দুইটি বিরুদ্ধ চিত্ত-গতিকে একই ভাবে গ্রহণ করিতে মাকে দেখা গিয়াছে। আবার কখনো শোকাতুরকে দেখিয়া হাসিতেছেন, কখনো বা উল্লসিতকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। কেউ হয়ত মায়ের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলে তাহাকে মধুর প্রবোধ বাক্যে—"এরূপ ক'রোনা" বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে পা সরাইয়া লইতেছেন। আবার হয়ত কেউ বহুক্ষণ পা ধরিয়া রহিয়াছেন ; তাহাকে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। একদিন একটি স্ত্রীলোক পুত্রশোকে কাতর হইয়া মার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মা এত জোরে কান্না সুরু করিয়া দিলেন যে স্ত্রীলোকটির শোক দুঃখ কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। সে মার হাসিমুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "মা আমি আর কাঁদিব না ; তুমি শান্ত হও।"

অনেকেই ইহা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে মাতাজীর শ্রীচরণ দর্শনে, তাঁর সুকোমল বাক্য শ্রবণে, তাঁর পদধূলি গ্রহণে, প্রাণের ভিতর শুদ্ধ ভাবের ব্যঞ্জনায় তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। একদিন এক বাঙ্গালী বিলাতফেরত

আধুনিক ভাবাপন্ন আমার বন্ধু—আমার অনুরোধে মার দর্শনে আসিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—মাতাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বহুদিনের বিস্মৃত গুরুদত্ত মন্ত্র চিত্তপটে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে অনেকে তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে পূজা জপ ধ্যানাদি রূপ ভগবদ্-ভজনে নিরত হইয়া তৎ তৎ কর্ম্মে শক্তি ও ঐকতানতা অনুভব করিয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে আদর্শরূপে বরণ করিয়া তাঁহার উপর সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য রাখিয়া অনেকে শ্রেয়োলাভ করিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে একবার কীর্ত্তনে মার সহিত ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ১৬।১৭ বছরের একটি মেয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল। ইহাতে তাহার শরীরের এমন পরিবর্ত্তন হইল যে সে হরিবোল হরিবোল করিতে করিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। ৩।৪ দিন তাহার ঢল ঢল ভাব ও হরিনাম মুখে লাগিয়াছিল।

ইহাও শুনা গিয়াছে যে কেহ কেহ মার দর্শনে বা স্পর্শে পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মাদি জনিত অনুতাপে মর্ম্মপীড়িত হইয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এমনও অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে সকলে যাহাকে পাপী বা হেয় বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়, সেও আসিয়া মায়ের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছে। মা বলেন—"যাঁরা কিছু করিতে অক্ষম, যাদের ধর্ম্মজীবনের কোন সহায় নাই, তাহাদিগকেই আমার বিশেষ প্রয়োজন।" এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে

যাহারা ধর্ম্মজীবনের বর্ণপরিচয় মাত্র ধরিয়াছে, তাহারাও মার কাছে শরণাগতি দিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। আবার যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানী বা কর্ম্মনিষ্ঠ লোক তাঁহারা ছ'দশদিন তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। মা বলেন—"সময় না হইলে কিছুই হয় না, যার যতটুকু পাইবার ছিল, পাইয়া গেল।"

কীর্ত্তনের সময় দেখা যাইত কুকুর ও ছাগল প্রভৃতি মার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকিত, তাঁহার হাঁটুর উপর মাথা রাখিত, কখনো বং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত ও লুটের বাতাসাদি মানুষের মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া খাইত। ছুরন্ত বিষধর সর্পকেও মার সঙ্গ নিতে দেখা গিয়াছে। একদিন সিদ্ধেশ্বরীর গাছ তলায় মা বসিয়াছিলেন। শ্রীমান গিরিজা-প্রসন্ন সরকার দেখিতে পাইয়াছিল যে হঠাৎ একটি সাপ মায়ের পিঠে ফণা ধরিয়া উঠিতেছে অথচ চারিদিক পরিষ্কার ছিল। নিরঞ্জনের বাড়ীতেও এক রাত্রিতে ঘরে ঘরে বৈছ্যুতিক আলোর ভিতর একটি সাপ মার পিছু পিছু চলিয়াছিল। অন্যত্রও মার সঙ্গে সর্প দর্শন অনেকবার হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমার উপদেশাদি এত সার্ব্বজনীন, সরল ও প্রাণ-স্পর্শী যে শুনিলে মনে হয় যেন অন্তরাত্মা বাণীরূপে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার প্রতিবাক্য শাশ্বত রাজ্যের আভাস স্বতঃই জাগাইয়া দেয়। তিনি কোন তর্ক যুক্তি

বা মীমাংসার ভিতর নাই, ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও কোন উপদেশ বা আদেশ দেন না। যার যার প্রাণের ভাবে যে যতটুকু পাইবার পাইয়া যায়।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে কেউ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে মনস্থ করিয়া মায়ের কাছে গিয়াছে, কিন্তু মার অপরের সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার সকল প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে। মা একবার দেওঘর বৈদ্যনাথ গেলে শ্রীমদ্ স্বামী বালানন্দজী বলিয়াছিলেন—"মা, তোমার গাঁটরী খোল।" মা জবাব দিয়াছিলেন—"গাঁটরী ত খোলাই আছে।"

মার কতগুলি উপদেশের সারাংশ "সদ্‌বাণী"তে ছাপানো হইয়াছে। কয়েকটি এখানেও উল্লিখিত হইল। প্রতিদিন হাসি ও গল্পের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতির কথা শোনা যায়, সে গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানগ্রন্থ হয়। সামান্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া অনেক বড় বড় তত্ত্বের অবতারণা করিতে শ্রীশ্রীমাকে দেখা যায়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার গুলি যে এক বিরাট সংসারের অন্তর্ভুক্ত, সীমাবদ্ধ জীবমণ্ডলী যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া এক অসীম লীলা-ময়ের সন্ধানে চলিয়াছে, ইহাই তাঁহার ভাষা, হাসি, গান, কীর্ত্তন, স্তোত্র, হাব-ভাব, চাল চলনে বিকাশ পায়, তাঁহার বাচিক বা কায়িক সকল ব্যবহারই উপদেশ পূর্ণ,

সাংসারিক ও ধর্ম্ম জীবন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁহার যে কোন গুণাবলীর একটিকে আদর্শ করিয়া চলিতে পারিলে মানব জীবন ধন্য হয়। পিপাসুর চোখে অনেক সময় প্রতিভাত হয় যে দ্বন্দ্ব-দৈন্য ঘুচাইবার জন্য তিনি যেন সর্ব্ব-মঙ্গল-কারণস্বরূপ এই মর্ত্ত্যদেহ গ্রহণ করিয়াছেন।

মার উপদেশের মূল তত্ত্ব এই,—ধর্ম্মের প্রাণ কোন জটিল বাঁধা আচারের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নয়। জীবন রক্ষা মানেই ধর্ম্ম রক্ষা এই ধারণা দৃঢ়ভাবে মনে রাখিয়া নিত্য দিনের আহার বিহার, অর্থার্জ্জন ইত্যাদির ভিতর দিয়া আন্তরিকতা ও সরসতার সহিত সহজ ধারায় ধর্ম্ম-সাধনাকে মানুষের স্বাভাবিক অনুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। মা বলেন—"শুভ মতি দিয়ে কর্ম্ম করো, কর্ম্মের ভিতর দিয়েই ধাপে ধাপে উঠ্‌তে চেষ্টা করো। সব কাজেই তাঁকে ধরে থাক, তা হলে আর কিছুই ছাড়্‌তে হবে না। তোমার কাজগুলিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, লক্ষপতির সন্ধানও সহজ হবে। মা যেমন শিশুকে যত্নের দ্বারা বড় করেন, দেখ্‌বে তুমিও তেমন বড় হ'য়ে উঠবে। যখন যে কোন কাজ কর্‌বে কায়-মনো-বাক্যে সরলতা ও সন্তোষের সহিত তাহা কর্‌বে, তা হলে কর্ম্মে পূর্ণতা আস্‌বে। সময় হ'লে শুক্‌নো পাতা-গুলি আপনা হতে ঝরে গিয়ে নূতন পাতা দেখা দিবে।" মা যখন সংসারের কাজ কর্ম্ম কর্‌তেন, শুনেছি তখন নাকি তাঁহার খাওয়া-দাওয়া বেশ-ভূষা এমন কি শরীর রক্ষা—

কোনদিকেই তাঁর খেয়াল থাকতো না। সারাদিন সংসারের কাজ-কর্ম্মে লেগে থাকতেন, কেবল ওপরওয়ালাদের হুকুম তামিল কর্‌তেন। পাড়া-পড়শীরা তাঁকে দেখে বল্‌ত,—'এ বউটার বুদ্ধি শুদ্ধি নেহাৎ কম।'

মা বলেন—"প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজের জন্য, যেমন স্কুল, আফিস, দোকান ইত্যাদির এক একটির নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে, সেরূপ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন একটি সময় যার যথা-সাধ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে। সঙ্কল্প করিতে হইবে যে উহা চির জীবনের জন্য পরম-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিলাম এবং সে সময় কেবল তাঁহার চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করিবে না। পরিবারস্থ সকলের এমন কি ভৃত্যাদির জন্যও এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সময় করিয়া দিবে। দীর্ঘ দিন এরূপ অভ্যাসের ফলে ঈশ্বর-চিন্তা তোমাদের স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। তার পর আর কোন ভাবনা নাই। দেখিবে যে এক অজ্ঞাত কৃপার ধারা সকল সময় অনুভূতিতে আসিয়া ভাবে এবং কর্ম্মে উৎসাহ ও বল দিতেছে। যেমন চাকরী করিলে পেন্সনের ব্যবস্থা হয়, পরে আর পরিশ্রমের দরকার হয় না, ইহাও তদ্রূপ। বরং তদপেক্ষাও ধর্ম্মরাজ্যের পারি-তোষিক অধিক। এবং উহা অধিকন্তু সহজ লভ্য।

"চাকরীর পেন্সন মৃত্যুর পরে থাকে না, কিন্তু সেই পেন্সনের আর লয় ক্ষয় নাই। যারা অর্থসঞ্চয় করে, তারা ঘরের কোন জায়গায় একটি "চোর-কুঠরী" রাখে,

তাতে যখন যা প্যারে জমায়, তার রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদা খেয়াল রাখে। তেমনি ভগবানের জন্য যে ভাবে যার ভাল লাগে, হৃদয়ের এক নিভৃত কোণায় একটু জায়গা করো। যখনি একটু অবসর পাও তখনই সেখানে তাঁর নাম বা ভাবের সঞ্চয় করতে থাকো।"

একদিন নানারকম প্রণামের প্রণালী দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন,—"যে যত আত্মহারা হ'য়ে একনিষ্ঠার সহিত **প্রণাম** করিতে পারে, সে তত শক্তি পায় ও আনন্দ লাভ করে। আর কিছু যদি না পারিস্, সকালে বিকালে দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া একটি কাতর **প্রণাম** দিবি। তাঁকে একটু স্মরণ করবার চেষ্টা করবি।" এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"দুই রকমের প্রণাম আছে, জানিস্? **পূর্ণ ঘট উপুড় করিয়া জল ঢালার মতো নিজের হৃদয়-মনের সকল ভার উজাড় করিয়া নমস্যকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া**। আর এক রকমের প্রণাম হচ্ছে তোদের পাউডার বাক্স হইতে ছোট ছোট ছিদ্রপথে পাউডার ছড়ানোর মত। তোদের মনের অধিকাংশ ভাব মনের কোটরেই পড়িয়া থাকে; এখানে ওখানে এক-আধটু শ্রদ্ধা বাহির হইয়া আসে।"

৺প্রমথবাবু পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়া ঢাকা হইতে বদলী হইয়াছেন। বিদায়কালীন মার চরণে প্রণাম করি-লেন। মা বলিলেন—"কে কাকে প্রণাম করে? তুমি

ত নিজকেই নিজে প্রণাম করিলে।". তিনি এ কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হইলেন।

একবার শ্রীমান্ অটলবিহারী ভট্টাচার্য্য শারদীয়া পূজা উপলক্ষে শাহ্‌বাগে গিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল মা আসিয়া সংসারী মায়ের মতো তাহার মাথা টিপিয়া দেন। মা গিয়া অটলের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া দিলেন। সে সুস্থ হইয়া রাজসাহী তাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে শাহ্‌বাগে এ প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। আমি বলিলাম,—"সে যেমন, তার বুদ্ধিও তেমন; মাকে দিয়া তার এরূপ সেবা পাওয়ার কি উদ্দেশ্য ছিল তা বুঝি না।" এ কথা শোনা মাত্রই মার চেহারা বদলাইয়া গেল। "তোর পাও টিপিয়া দেবো নাকি?" এই বলিতে বলিতে আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। আমি ছুটিতে লাগিলাম। মা আমার পিছু পিছু আসিতেই পিতাজী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। বালিকার মত মার সেই তেজোময়ী মূর্ত্তি এখনও আমার স্মরণে আছে। সে সময় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক-মোহন মুখার্জ্জী (পূজ্যাস্পদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী) "মা, মা", চীৎকার করিয়া মায়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন। এ উপলক্ষে মা বলিয়াছিলেন—"যেরূপ মাথা হাত পা ইত্যাদি সব নিয়াই একটি মানুষ, সেরূপ আমি দেখি তোরাই তো সব আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশেষ।"

একদিন বেনারসের স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মায়ের শ্রী-পাদপদ্মে কতকগুলি ফুল উৎসর্গ করিলেন। একটি লোক সে সময় দেব-পূজার জন্য ফুলের সাজি নিয়া মার পাশ দিয়া যাইতেছিল; মা নিবেদিত ফুলগুলি সাজিতে রাখিয়া দিলেন। কেন এমন করিলেন নির্ম্মলবাবু জিজ্ঞাসা করিতে মা বলিলেন—"যাঁর মাথা তাঁরই তো পা। সকলে সকল ভাবে একেরই তো পূজা করিতেছে।"

একদিন দেখি মা বাঁশের ছোট একটি কঞ্চি নিয়া মাটির উপর ঘা দিতেছেন। একটি মাছির গায়ে ঘা লাগিতেই উহা মরিয়া গেল। মা মৃত মাছিটি তাড়াতাড়ি হাতে করিয়া লইলেন। বহুলোক। নানা প্রসঙ্গে ৪।৫ ঘণ্টা চলিয়া গেল। তারপর মা হাতের মুঠা হইতে মাছিটিকে বাহির করিয়া আমাকে বলিলেন,—"এই যে মাছিটা মরিয়া গিয়াছে, ইহার একটা সদগতি করিতে পারিস্ কি?" আমি বলিলাম—"শুনিয়াছি, মানুষের দেহের মধ্যেই স্বর্গ আছে" এই বলিয়া মার হাত হইতে মাছিটি লইয়া আমি গিলিয়া ফেলিলাম।

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"করিলি কি? মাছি খেলে না ভেদ বমি হয়?" আমি বলিলাম,—"যদি আপনার আদেশে আমার ভিতর দিয়া ইহার একটা সদ্গতি হইয়া যায়, তবে আমার কিছুই হইবে না।" সত্যই আমার কোন অসুখ হয় নাই।

মা এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"পোকা, মাকড়, মাছি,

কীট, পতঙ্গ, মানুষ সবাই তো এক পরিবার, কার সহিত কার জন্ম-জন্মান্তরের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে কে বলিবে ?"

আমার এক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান বন্ধু (৺ মৌলবী জৈনোদ্দি হোসেন) ছিলেন। তিনি প্রায় সকল সময়ই ঈশ্বর-চিন্তায় কাটাইতেন। এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমি ও নিরঞ্জন তাঁহাকে লইয়া শাহ্‌বাগে গেলাম। দেখিলাম তখন নাট-মণ্ডপে কীর্ত্তন জমিয়াছে। আমরা তিনজনে কিছুদূরে এক গাছের তলায় এমন ভাবে দাঁড়াইলাম যে, যেন কীর্ত্তনের স্থান হইতে আমাদের কেহ দেখিতে না পায়। প্রায় আধ ঘণ্টার পর দেখি, হঠাৎ মা নাটমণ্ডপ হইতে বাহির হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও আলো নিয়া আসিলেন। মা হেলিতে দুলিতে দ্রুতপদে চলিয়া ঠিক আমারা যেখানে ছিলাম সেখানে আসিয়া তাঁহার ডান হাতে মুসলমান বন্ধুটির গা স্পর্শ করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। আমরা তিনজনও মার পিছু পিছু চলিলাম। শাহ্‌বাগের এক কোনায় এক মুসলনান ফকিরের সুরক্ষিত কবর আছে। মা সে কবরে গিয়া নামাজের নিয়মানুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া, উঠা, বসা, এবং নামাজের পঠনীয় বচনাদি উচ্চারণের দ্বারা নামাজ পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে মুসলমান বন্ধুটিও যোগ দিলেন। নাট মণ্ডপে ফিরিয়া পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মুসলমান বন্ধুটিও সকলের সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ঘটনাচক্রে যে লোকটির উপর

বৃহস্পতিবারে কবরে বাতি ও বাতাসা দিবার ভার ছিল, সে দিন সে আসে নাই। মার কথায় মুসলমান বন্ধুটি সেখানে বাতাসা উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে কবরে নিবেদিত বাতাসা মাকে খাওয়ানো। মার নিকট তিনি বাতাসার থালা লইয়া যাইতেই মা হাঁ করিয়া রহিলেন এবং কিছু বাতাসা তিনি মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। তিনিও হরিলুটের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তিনি খুব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং মাকে দেখিবার পূর্ব্বে তাঁর ভাব অন্যরকম ছিল। কিন্তু দেখিলাম উক্ত ঘটনাদির পর মার উপর তাঁহার অটল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগ্রত হইয়াছিল।

মা আরও একদিন এক মুসলমান বেগমের আবদারে সে কবরে নামাজ পড়িয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন মার নামাজের পাঠগুলির সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকের মিল আছে। মা বলিয়াছিলেন,—"যে ফকিরের সমাধি ঐ কবরে আছে তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর আমি ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে মৈমনসিং বাজিতপুর থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ঢাকা শাহ্‌বাগে আসিবার পরও তাঁহার এবং তাঁহার এক শিষ্যের সহিত এ বাগানে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ফকির সাহেব খুব দীর্ঘকায় এবং তাঁহার শরীর আরব দেশীয়"। অনুসন্ধানে এইরূপই জানা গিয়াছিল।

একবার মা বিক্রমপুর রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ী গিয়াছেন। সেখানে সেইদিন হরিনাম কীর্ত্তন হইতেছে।

মার ভাবান্তর দেখা দিল। প্রায় ১৫০।২০০ হাত দূরে অন্ধকারে হিন্দুর মত কাপড় পরিয়া একটি মুসলমান ছেলে গোপনে বসিয়াছিল। মা ভিড় ঠেলিয়া উহার নিকট গিয়া আল্লা, আল্লাহো আকবর ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে মার সঙ্গে যোগ দিল। সে বলিয়াছিল,—"যেরূপ সহজ ও পরিষ্কার ভাবে মার মুখ হইতে আল্লার নাম বাহির হইয়াছিল, আমরা চেষ্টা করিয়াও তাহা পারিব না। মার সঙ্গে আল্লার নাম করিয়া আমি যেরূপ আনন্দ পাইয়াছি, আমার জীবনে এরূপ কোনদিন হয় নাই।"

এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে মা হরিনাম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হরিনাম করিতে করিতে কখনো কখনো তাঁহাদের চোখ দিয়া জল পড়িত। হিন্দু দেবদেবীকেও তাঁহারা সম্মান করিত ও মাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করিত। এ সব প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন "হিন্দু মুসলমান বা অন্যান্য জাতি সবাই তো এক, একজনাকেই তো সবাই চায়, সবাই ডাকে। নামাজ যা' কীর্ত্তনও তা'।"

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কুশারী ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা মোক্ষদা সুন্দরী দেবী (পিতাজীর ভগ্নি), মাকে বড় ভালবাসেন, মাকে কাছে পাইলে, মার বর্ত্তমান অবস্থাদিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহযোগে খুব আনন্দ করেন। একবার কুশারী মহাশয় ঢাকা আসিয়াছেন, অন্যত্র আছেন। একদিন শাহ্‌বাগে মার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা করার

পর যাইবার জন্য উঠিলেন, আর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আপনার যদি শক্তি থাকে, আমাকে ভস্ম করেন তো?" এই বলিতে বলিতে কয়েকটি আগর বাতী জ্বালাইয়া হাতে করিয়া রওনা হইলেন। পিতাজী ও মা বাহিরে কোথায় যাইবার কথা ছিল, তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গ নিলেন। খুব রৌদ্র কুশারী মহাশয় তাঁহার ছাতাখানি নিয়া মায়ের মাথায় ধরিলেন। একসঙ্গে দুইজন চলিতেছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ কুশারী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন বলিলেন—"আরে আগুন কোথা হইতে মাথার উপর পড়িতেছে? আমাকে ভস্ম করছেন নাকি? ভস্ম করছেন নাকি? সত্যই আপনার শক্তির পরিচয় খুব পেয়েছি, আর ভস্ম করবেন না।" ব্যস্ত ভাবে এইরূপ বলিতে বলিতে ছাতাখানির দিকে চাহিয়া দেখেন যে ছাতাটি এরই মধ্যে কতটুকু পুড়িয়া গিয়াছে।

একদিন একটি লোক কতগুলি ফুল তাঁহার পায়ে ছড়াইয়া দিয়া গেল। মা কয়েকটি কুড়াইয়া লইয়া এক একটি ফুলের পাঁপড়ি, কেশর ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম, বহির্জগৎ প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া ভগবানের অনন্তলীলা বুঝাইয়া দিলেন।

দেশ বিদেশে ঘোরা সম্বন্ধে একদিন মা বলিয়াছিলেন—"আমি দেখি জগৎভরা একটি বাগান। জীব জন্তু উদ্ভিদাদি যতকিছু আছে সবাই এই বাগানে নানারকমে খেলছে—প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্টতা আছে. তাই দেখে আমার

আনন্দ হয়। তোরা সবাই মিলে বাগানের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে দিয়েছিস্। আমি বাগানের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাই, তাতে তোরা কেন এত আকুল হয়ে পড়িস্ ?"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন মা বলিলেন,—"প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ, প্রার্থনার শক্তি অমোঘ এবং প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা' প্রাণে আসে, তাঁকে জানাবি, আর সরল ও ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবি।" সে সময়ে আমি খবর কাগজে পড়িয়াছিলাম যে লর্ড আরউইন্ ভারতের বড় লাট নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বলিয়াছিলেন— "তুমি ফলাফলের কথা ভাবিও না, কিছুই আমাদের হাতে নাই; তবে প্রার্থনাদির দ্বারা ভবিষ্যতের কিছু আভাস পাওয়া যায়। পরে পিতাপুত্র উভয়ে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করেন। বাহির হইয়া পিতা বলিলেন—"তোমাকে ভারতে যাইতেই হইবে।" লর্ড আরউইন বলিলেন—"আমিও সেইরূপ বুঝিয়াছি।" মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"বেশ ভাল কথা। কেবল শিশুর মত বিশ্বাস চাই। অভ্যাসের দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তি গড়িয়া উঠে, শুদ্ধ বিশ্বাস উদয় হইলে সরল প্রার্থনা আসে। প্রার্থনায় সত্যিকার ভাব জাগিলে তিনি কৃপা করিয়া ফলস্বরূপে প্রকাশ পান।"

আর একদিন মা বলিয়াছিলেন—"কৃপা বলিলেই

অহৈতুকী কৃপা বুঝায়। যখন কৃপা হবার তখন তাঁর ইচ্ছাতেই কৃপা অবতীর্ণ হয়। যেমন দেখ, শিশু খেলা করতে করতে মাকে ভুলে গেছে, মা হঠাৎ গিয়া তাকে কোলে নিলেন। শিশু না ডাকতেই মার স্নেহ প্রকাশ হলো। তোরা বলবি সকল কৃপা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। তা' এক হিসাবে সত্য হলেও, অন্য পক্ষে তিনি স্বাধীন বলিয়া তাঁহার কৃপার কারণ কি এই প্রশ্ন মনে জাগিলেও তাহা জিজ্ঞাস্য বা আলোচ্য নয়। তাঁর কৃপা তো সকলের উপর সমানভাবে রহিয়াছে। যখন কাহারো উঁহা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করার সময় বা যোগ্যতা আসে, তখন সে দেখিতে পায় যে সে কৃপালাভ করিতেছে। একটা কিছু আশ্রয় কর্, তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা কর্, তা'হলে দেখতে পাবি বাঁশ-সংলগ্ন বালতিটি কুয়োয় ফেলিয়া দিলে 'যেরূপ জলপূর্ণ হইয়া উপরে অনায়াসে চলিয়া আসে, তদ্রূপ তাঁর কৃপা অজস্র পাইতে পার্‌বি।" এ কথার প্রসঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে যিনি ভগবানকে দেখিয়াছেন তিনি অন্য কাহাকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া দিতে পারেন কি না? মা বলিয়াছিলেন "যাহার দেখবার সময় হয় সেই দেখতে পারে বই কি। তবে সেই যে তাঁকে দর্শন করিয়াছে সেই প্রথম পথ দেখাইবার উপলক্ষ হইতে পারে।"

একদিন মার নিকট জন্মান্তর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মা বলিলেন—"জন্মান্তর সত্য বই কি?

চোখের উপর ছানি পড়িলে উহা কাটাইয়া দিলে যেরূপ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাওয়া যায় তদ্রূপ ধ্যানযোগে 'বিশুদ্ধ বুদ্ধি স্বরূপে অবস্থাপন করিতে পারিলে বা মন্ত্র ও দেব-তত্ত্বের বিকাশ লাভ ঘটে; পূর্ব্বজন্মাদির সংস্কার চিত্তে ভাসিয়া উঠে। যেমন ঢাকায় বসিয়া কলিকাতার চিত্র অন্তরে ধারণা করিতে পারিস্, তদপেক্ষাও পরিষ্কাররূপে পূর্ব্বজন্মের ছবি চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে।" মা বলিয়াছেন—"তোদের দেখিলে কখনো কখনো তোদের জন্ম জন্মান্তরের ছবি আমার চোখে ভাসিয়া উঠে।" একবার মা কলিকাতা' গেলে একজন ভদ্রলোক, তাহার স্ত্রী ও ৭।৮ বছরের একটি ছেলেকে নিয়া মাকে দেখিতে আসে। মা ছেলেটিকে দেখিয়াই বলিলেন "পূর্ব্বজন্মে সে এ শরীরের ভাই ছিল"। মার এক ভাই ছেলে বয়সে মারা যায়, মৃত্যুর পূর্ব্বে চোট পাইয়া তাহার এক হাত বাঁকিয়া গিয়াছিল। এ ছেলেটিরও হাত একখানা বাঁকা ছিল।

কোন কোন সময় শ্রীশ্রীমার অতি আশ্চর্য্য তেজ ও সাহস পরিলক্ষিত হয়, ভয়-ভীতির লেশমাত্রও দেখা যায় না। যখন যা' তাঁর চিত্তে আসে বা তাঁর মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া চাইই চাই। তাঁহার ভাব ও কর্ম্ম অবাধ গতিতে চলিতে পারিলে জীবের কল্যাণের হেতু হয়; বাধা পাইলে অনেক স্থলে অশুভ ফল প্রসব করে। ছেলে-বেলায়ও মার এরূপ লীলা প্রকাশ পাইত। ৪।৫ বৎসর

বয়সে মা প্রত্যহ সকালে তাঁর 'বড়মার' নিকট হইতে ঘোল আনিতে যাইতেন। একদিন ঘোল আনিবার পাত্রটি উপুর করিয়া লইয়া যান। বড়মা তা' দেখিয়া খুব বিরক্ত হইয়া বলেন—"রোজ ঘোল খাস্, যা আজ ঘোল পাবিনা।" একথা বলিতে না বলিতেই বড়মা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার দধি মন্থনের ভাঁড়টি ফুটা হইয়া সমস্ত দই পড়িয়া যাইতেছে। একি হইল বলিয়া তিনি অবাক হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহার পর হইতে মার কোনদিন যাইতে দেরী হইলেও ডাকিয়া ঘোল দিতেন।

মা ফুলের মত কোমল হইলেও কখনও কখনও আমাদের কর্ম্মবশতঃ বজ্রের মত কঠিন হইয়াছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। এক বার আমার কোন অযৌক্তিক কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন,—"যা' যা' দূর হয়ে যা।" একবার মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলাম, তাহাতে মার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহাতে তাঁহার শাসনের চূড়ান্ত আমার সৌভাগ্যে ঘটিয়াছে। কোন অন্যায় করিয়া দুঃখিত হইলেই মার অমৃতবর্ষী দৃষ্টির করুণায় চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু মনে যদি রাগ-অভিমানের উদয় হয়, তবে অনুতপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত—মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হৃদয় জর্জ্জরিত হইত। একবার পিতাজী আমার হইয়া মাকে বুঝাইতেছিলেন, তাহাতে মা বলিয়াছিলেন—"যাহার উপর কঠোর ব্যবস্থা করিলে খাটে এবং যে সহ্য করিতে

পারে, তাহার উপরই কঠোর ব্যবস্থা হইয়া থাকে! গাছ কাটিতে গেলে প্রথমে কুড়ুলের দরকার; তারপর কাটারী, তারপর ছোট ছোট ডাল পালা হাতের সাহায্যেও ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। তেমনি শাসন, কঠোর ও কোমল দুইই দরকার।"

আর্ত্ত ও পীড়িতের কল্যাণ-কল্পে মার অমিত কৃপা নানা-রূপে নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মা বলেন—"আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করিনা বা বলিনা,—তোমাদের ভাবে তোমরা যা করাও বা বলাও, তাই করি বা বলি। অনেক সময় কার কি হইবে না হইবে আমি দেখিতে পাই, কিন্তু সে কথা মুখে আসে না"। কত ছেলে মেয়ে পরীক্ষা-পাশ, কতলোক চাকরী, ব্যবসা, কন্যার বিবাহ, পুত্র লাভ, ব্যাধি-মুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে পরোক্ষে বা অপরোক্ষে মায়ের কৃপালাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কত লোককে রোগমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ক্ষত করিয়াছেন বা তাদের উপলক্ষে ভুগিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এমনও দেখা গিয়াছে যে যাহাদের সহিত কখনো সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহার অসুখ বা অশান্তির খবর অপরের মুখে মার কাছে আসিয়াছে, অথবা মার মনে স্বতঃই সে চিত্র উদয় হইয়াছে, সে লোক সুস্থ বা বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। মার কাছে শুনিয়াছি যে বিষয় দেখিলে বা শুনিলে তাঁহার স্মরণে থাকে, তাহার কোন না কোন

একটি সুব্যবস্থা হইয়া যায়। অনেকে আবার রোগে শোকে স্বপ্নে মার দর্শন পাইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছে।

একবার পক্ষাঘাতগ্রস্তা একটি ১২ বছরের মেয়ে লইয়া তাহার পিতামাতা মার শরণাপন্ন হয়। মা মেয়েটিকে গড়াগড়ি দিতে বলিলেন। সে নড়িতে চড়িতে পারেনা, এ পাশ ও পাশ ফিরিবে কি? মা ঠাকুর পূজার জন্য সুপারী কাটিতেছিলেন, তাহার কয়েক টুকরা হাত হইতে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—"ধর্ "এ গুলি হাত বাড়াইয়া নে।" সে অতি কষ্টে তাহা নিল। তারপর তাহারা বিদায় হইল। বাড়ীতে গিয়া মেয়েটি শুইয়া আছে, বিকালে বাহিরে রাস্তায় একটি গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সে হঠাৎ লাফ দিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া দৌড়াইয়া গাড়ী দেখিতে গেল। তারপর হইতে ধীরে ধীরে রীতিমত চলা ফেরা করিতে লাগিল।

একদিন ঢাকায় মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে মা বলিলেন— "রাস্তা দিয়া যে গাড়ীখানা যাইতেছে, ঐটিকে রাখ্"; গাড়ী রাখা হইল, মা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় যাইবেন"? মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার বাড়ী।" সে জাতিতে মুসলমান ছিল। মার এ কথা শুনিয়া সে আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার বাড়ীতে নিয়া গেল। সেখানে গিয়া দেখা গেল যে একটি বৃদ্ধ মুমূর্ষ অবস্থায় পড়িয়া আছে, আশে পাশে আত্মীয়

স্বজনেরা কান্নাকাটি করিতেছে। মা আমাকে বলিলেন, "কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়।" মিষ্টি আনিয়া সকলকে বিতরণ করা হইল, পরে মা চলিয়া আসিলেন। তারপর শুনা গিয়াছিল—সে লোকটি সেইবার সারিয়া উঠিয়াছিল। কোন রোগীকে হয়ত বলিয়াছেন চোখ বুজিয়া সন্ধ্যাবেলা মাটিতে যা কিছু পাও, তাহাই ব্যবহার করিও। তদনুরূপ করিয়া সে ভাল হইয়া গিয়াছে। কখনো রোগীকে নিজের জন্য তৈয়ারি ভাল ভাত তরকারী সব খাইতে বলিলেন ও তাহার পথ্য সাগু বার্লি নিজে গ্রহণ করিলেন। বিষম জ্বরে বা পেটের কঠিন পীড়ায় মার আদেশে বিরুদ্ধ ভোজনাদি করিয়াও অনেকে প্রতীকার পাইয়াছে।

আমার ছেলেটির বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর, সে রক্তামাশয়ে ১০।১২ দিন যাবৎ ভুগিতেছিল। মা এক রাত্রি তাহাকে দেখিতে আসিলেন। সে সময় হইতে তার সুস্থ হওয়ার লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিল, কিন্তু মা তারপর দিন ১২ ঘণ্টা রক্তামাশয়ে কষ্ট পাইলেন। কখনো আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে রোগী সুস্থ হইবার নয়, সে হয়ত কোন আদেশ পাইয়াও রক্ষা করে নাই বা পালন করিতে চেষ্টা করিয়াও কোন ঘটনা চক্রে শেষ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই। এ সব ক্ষেত্রে মার হাবভাবে অনেক সময় প্রথমেই নিষ্ফলতার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রও স্বীকার করিয়াছেন যে উৎকট শুভ কর্ম্মাদির দ্বারা কৃপার আনুকূল্যে প্রারব্ধ খণ্ডন

করা যায়," কিন্তু সে কৃপা-আকর্ষণকারী কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা কঠিন, যদি না অহৈতুকী কৃপা হয়।

মা বলেন—"দৃষ্টি যতক্ষণ, সৃষ্টি ততক্ষণ। আমি তুমি, সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকারে দ্বন্দ্ব। স্বভাবের কাজ বা স্বধর্ম্মে জোর দাও, অভাবের বা ইন্দ্রিয়াদির কাজ ত্যাগ হ'য়ে গেলে অন্তরাত্মা জাগ্রত হবেন। তখন তাঁহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারলেই দৃষ্টি সৃষ্টির ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে।"

শৈশবে মার লেখাপড়ার তেমন সুবিধা ছিল না, এবং তিনিও সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখা যাইত যে পুস্তকের যে যে স্থানে তাঁহার একবার দৃষ্টি পড়িত, স্কুল মাষ্টার কি স্কুল ইনস্‌পেক্টার সে সে পাঠ হইতে প্রশ্নাদি করিতেন। একারণে স্কুলে তিনি একজন ভাল ছাত্রী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। নিজে কোন বই পড়া বা নিজের হাতে কিছু লেখা বালিকা বয়স হইতে তাঁহার বিশেষ অভ্যাস ছিল না। তবুও তাঁহাকে অপরূপ জ্ঞান ভূমিতে অবস্থিত দেখা যায়। যখন তিনি যে বিষয়টি ধরেন তখন তাহাতে তাঁহার অসীম প্রভাব প্রকাশ পায়।

একদিন মা কথায় কথায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—ইটালী কি ?' কয়েকদিন পর সকালবেলা ইটালীয়ান্ প্রোফেসর মিষ্টার টুসী শাহ্‌বাগে উপস্থিত হইলেন। তিনি ঢাকা ইউনিভারসিটিতে আসিয়াছিলেন। সাহেব ইংরাজীতে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অনুবাদিত হইয়া

৪ঠা আষাঢ় ১৩৩৭

হে পরম পুরুষ! জগৎ পতি পতি। পিতা
মাতা সন্তান এবং সর্ব্ব ধ্যান সমতা,
দেখিতেছি সময় যাইতেছে আরও
হতাশ হইবার কোন ও কারণ নাই।
শিশুর মত অটল বিশ্বাস ও -
আকুল পিপাসা নিয়া চলিতে হয়,
তবে ফলও অবশ্য দেখিতে পাইবে।

শ্রী নির্ম্মলা সুন্দরী দেবী

শ্রীশ্রীমায়ের হস্তাক্ষর [১১৭ পৃষ্ঠা

মাকে বুঝাইবার পূর্ব্বেই মা সংস্কৃতে সাহেবের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন।

তাঁহার একটুখানি হস্তলিপির জন্য অনেক প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে বলেন—"আমি তো ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারি না, যদি সময় হয় পাইবি।"

সৌভাগ্য বশতঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় যে লিপি করেন তাহা এখানে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের অনেক স্থানে অনেক ফটো তোলা হইয়াছে। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত ৪০০ রকমের ফটোর কম হইবেনা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়' এই এক ছবির মূর্ত্তির সহিত অন্য ছবির মুখের সম্পূর্ণ মিল হয় না। ঢাকার শ্রীমান সুবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত ও চট্টগ্রামের শ্রীযুত শশীভূষণ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য অনেকে শ্রীশ্রীমায়ের বহু ফটো তুলিয়াছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে শারদীয় উৎসবে শশীবাবু ঢাকায় আসিলেন এবং আমরা কয়েকজন মিলিয়া একদিন ভোরে মার ফটো তুলিতে শাহ্‌বাগ গেলাম।

সেখানে শুনিলাম মা কোথায় কেহ বলিতে পারেনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি একটি অন্ধকার ঘরে অসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। শশীবাবুর সেদিন বিকালে ঢাকা হইতে দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কথা। একারণ তখনই মার একটি ফটো তুলিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। পিতাজীকে বিশেষ করিয়া বলা হইলে তিনি এবং আমি

আমরা দুইজনে গিয়া মাকে ধরিয়া আনিলাম এবং ফটো তুলিবার জন্য তাঁহাকে বসাইয়া আমরা ক্যামেরার সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। মার তখন ঢলু ঢলু ভাব। ছবি নড়িয়া গিয়াছে। এ আশঙ্কায় শশীবাবু ১৮খানি প্লেইট ব্যবহার করিলেন। পরে চট্টগ্রাম হইতে খবর আসিল যে যে ১৮খানি প্লেইটের মধ্যে শেষ ছবিটিই ভালো বাহির হইয়াছে এবং মার ললাটে চন্দ্রের মত গোলাকার একটি আলোক পিণ্ডের প্রতিকৃতি দেখা যাইতেছে। আরও বিশেষত্ব এই মার পিছনে আমার ছবিও উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহার একটি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ফটো তৈয়ারি হইয়া আসিলে চিত্রকরের কৌশল বলিয়া কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল। এ সম্বন্ধে পরে মা কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"যখন অন্ধকার ঘরে এ শরীরটা পড়িয়া রহিয়াছিল, তখন চারিদিকে এক জ্যোতিতে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছিল। ফটো তুলিবার জন্য বাহিরে আনিয়া বসাইলেও সে আলোটি ছিল। ক্রমশ তাহা সঙ্কুচিত হইয়া কপালের উপর গিয়াছিল। আমার খেয়ালে আসিয়াছিল জ্যোতিশও যেন পিছনে রহিয়াছে। এখন কিসে কি হইয়াছে তোমরাই বোঝ।" সে ছবিখানি যোগবিভূতি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"উক্ত ফটো তোলার সময় এক একবার Slide এ

শ্রীশ্রীমায়ের পশ্চাতে ভাইজীর ছায়ামূর্ত্তি ১৯২৬ ইং

[১১৮ পৃষ্ঠা

৬খানি load করিয়া তিনবারে মোট আঠারোখানি plate load করা হয় এবং সবগুলিই ব্যবহৃত হয়। প্রথম কয়-খানিতে কিছুই উঠে নাই। পরের দিকে আবছায়ার মত একটি ছায়াপাত হইয়াছিল। কেবল শেষটিতেই পূর্ণরূপে মায়ের ছবি পাওয়া গিয়াছিল। আপনি camera এর range এর বহুদূরে ছিলেন এবং মার দিকে তাকাইয়া সময় মত আমাকে exposure দিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে-ছিলেন। প্রথম হইতেই প্রত্যেকটি expose করার সময় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, এবং খারাপ হইয়া গিয়াছে এই আশঙ্কায় দুঃখ আসিয়াছিল। শেষের plate খানি expose হইলে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে আমার মন প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। তখন সবেমাত্র আমি মার চরণে প্রথম আশ্রয় লইয়াছিলাম। আজকালের দিনে যদি সে রকম একটি ঘটনা হইত তাহা হইলে আমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত বলিতে পারিনা।”

৫।৫।৩৭ শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত

আশ্রম

ঢাকায় শ্রীশ্রীমায়ের একটি আশ্রমের অভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি শাহ্‌বাগে গিয়াছি। মা বলিলেন, "চল্, মাঠে যাই।" পিতাজী, মা ও আমি রম্‌না মাঠে যেখানে ভগ্ন দেবালয়টি (বর্ত্তমান আশ্রম) ছিল, তাহার কিছুদূরে গিয়া বসিলাম। আমি মার চরণে নিবেদন করিলাম—"শাহ্‌বাগে তো আগে পরে কীর্ত্তনাদি চলিবে না, একটি আশ্রমের বিশেষ দরকার।" মা বলিলেন—"জগৎ ভরাই তো আশ্রম, নূতন করিয়া 'আশ্রম কি করিবি?" আমি বলিলাম—"আমরা তো বেশী কিছু চাহি না, কেবল এমন একটি স্থান চাই—যেখানে আপনার চরণের চারিধারে আমরা সবাই মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে পারি।" পিতাজীও আমার কথায় সায় দিলেন। মা তখন বলিয়া উঠিলেন—"যদি এ রকম কিছু করিস্, তবে ঐ যে ভাঙা বাড়ীখানি দেখিতেছিস্, ঐ স্থানই প্রশস্ত, উহা তোদের পুরাণো বাড়ী।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চুপ করিয়া গেলেন। ঐ জায়গাটিতে সে সময় একটি ভাঙা শিব মন্দিরের, চারিধার ইট পাথর ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উহাতে নানারকমের সাপ দেখা যাইত। আশ্রম প্রতিষ্ঠার

পরও ওখানে বড় বড় সাপ দেখা গিয়াছে। মা তখন কোন কোন সোমবারে ঐ ভগ্ন শিবালয়ে দুধকলা দেওয়াইতেন। এক সোমবার একটি নূতন হাঁড়ীতে ৫।৭টি কলা ও কিছু কাঁচা দুধ দেওয়া হইল। সাতদিন পরে রাত্রি প্রায় ৯।১০টার সময় মা গিয়া দেখেন দুধকলা যেমন দেওয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনই আছে একটি পিঁপড়াও ধরে নাই। মা নিজে সে দুধ খাইবেন বলাতে অনেকে উহা বিষাক্ত হইয়াছে বলিয়া খাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু মার যে কথা সে কাজ, তিনি এক চুমুক খাইতেই সকলে ব্যগ্র হইয়া প্রসাদ নিল; অবশিষ্ট তথায় রাখিয়া আসা হইল। পরদিন সকালবেলা গিয়া দেখা গেল সমস্ত হাঁড়িটি কিছুতে যেন চাটিয়া খাইয়াছে।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে পূর্ব্বোক্ত স্থানটি রম্‌না কালীর সম্পত্তি। তথাকার ঠাকুর শ্রীযুত নিত্যানন্দ গিরিকে বলাতে তিনি বলিলেন যে ৬০০০৲ টাকার কমে ঐ জমি ছাড়িবেন না। কয়েক মাস পরে স্বর্গীয় ৺নিরঞ্জন ঢাকায় আসিলে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমে আমি উৎকট রোগে শয্যাশায়ী হইলাম। একদিন ৺নিরঞ্জন বলিলেন—"মৈমন্‌সিং গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী হইতে ১০০০৲ টাকা সাহায্য আসিয়াছে, তুমি ভাল হও, পরে যাহা হয় করা যাইবে।" ৺নিরঞ্জন ক্রমে ক্রমে আরো অর্থ সংগ্রহ করিল, কিন্তু ৬০০০৲ টাকার কমে উক্ত

ঠাকুর জমিটি কিছুতেই হস্তান্তর করিতে রাজি হয় না। প্রায় দেড় বৎসর রোগ ভোগের পর পুনরায় ঢাকায় গিয়া কাজে হাজির হইলাম। অন্যান্য জায়গা ও আশ্রমের জন্য ঘুরিয়া দেখা হইল কিন্তু মার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি ব্যতীত কোনটিই আর মনে ধরে না। কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছি। ১৯২৯ ইংরাজী অব্দের প্রথমে মা কলিকাতায় ছিলেন। শ্রীমান বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপধ্যায় ঢাকা হইতে কলিকাতা গেলে মার সহিত আশ্রম সম্বন্ধে আলাপ হইল। সে আসিয়া এ খবর আমাকে দিল। প্রাণে যেন এক নবীন উৎসাহ জাগিল। আমি একদিন স্থির করিলাম আজই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া যা' হয় শেষ করিব। এই ভাবিয়া বাড়ীর বাহির হইতেই দেখি সঙ্গে সঙ্গে মা যেন ছায়ামূর্ত্তির মত চলিয়াছেন, তখন মনে হইল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ঠাকুর বলিলেন "যখন এতটাকা আপনারা দিতে পারিতেছেন না, তখন উপস্থিত অস্থায়ী বন্দোবস্ত করুন; অন্য কোনরকম স্থায়ী ব্যবস্থা পরেও হইতে পারে। কালীমন্দিরও ত আপনাদের, যা' ভাল হয় তাই করুন।" নানা বাগ্-বিতণ্ডার পর ৫০০৲ টাকা নজর ও বার্ষিক ৩০০৲ টাকা খাজানায় উক্ত স্থান অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করার সর্ত্ত ঠিক হইয়া গেল। এরূপ বন্দোবস্ত অনেকের মনঃপুত হইল না, হইতেও পারে না; কিন্তু আশ্রম করিতে হইলে ইহাই একমাত্র উপযুক্ত স্থান; মার আশ্রম, মাই যখন যা' দরকার করিবেন এবং

আমাদের ভবিষ্যৎ-চিন্তা বৃথা, ইত্যাদি মনে করিয়া জমিটি হস্তগত করা হইল। শ্রীযুত মথুরা নাথ বসু, শ্রীযুত নিশিকান্ত মিত্র ও ৺ বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে চৈত্র (১৯২৯ ইংরেজীর ১৩ই এপ্রিল) সেই "পুরাণো বাড়ী" ভগ্নাবস্থায় মায়ের পাদস্পর্শ করানো হইল। ৺নিরঞ্জন তখন স্ত্রী বিয়োগে ব্যথিত। সে দিন সে তথায় উপস্থিত ছিল। ২ মাস পরে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার ভিক্ষালব্ধ অর্থে ই আশ্রমের ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে; কাজেই তাহারা স্বামী-স্ত্রী যে লোকেই থাকুক না কেন, মার চরণ-রেণুর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ চলিতেছে। আশ্রম সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন,—"আশ্রম মানেই শুদ্ধ পবিত্র স্থান, যেখানে আসা মাত্রই ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হয়। সকলেই চেষ্টা করিবে যে দিন-রাত্রি ইহার বায়ুমণ্ডল সাধন ভজন, সৎচিন্তা, সদালোচনা প্রভৃতির প্রভাবে বিশুদ্ধ থাকে, এখানে মাথা গুঁজিবার দু' একটি ছোট ছোট ঘর থাকিলেই যথেষ্ট। তাই সর্ব্ব প্রথমে মায়ের জন্য একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের চলাফেরা বা ভাবের খেলা অভাবনীয় রূপে বিচিত্র। কখন কি করেন, কেন করেন, তা' বুঝিবার বা' তাহাতে বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ১৯শে বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে (১৯২৯ ইংরাজীর ২রা মে) শ্রীশ্রীমা নূতন রমনা আশ্রমে প্রবেশ করেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দের রোল।

শ্রীযুত বাউল চন্দ্র বসাক আসিয়া ফুলের মালায়, ফুলের মুকুটে ও বালায় মাকে কৃষ্ণের মতো সাজাইলেন। মাও সকলের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া আছেন। আমি দেখিলাম এত আনন্দের ভিতরেও যেন সব নিরানন্দ। আমি একান্তে দাঁড়াইয়া মায়ের হাবভাব লক্ষ্য করিতেছিলাম। বোধ হইতে লাগিল তাঁর দৃষ্টি ও মন কোথায় যেন উদাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রি ২টায় আমি বাড়ীতে ফিরিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় পিতাজী আমাদের পাড়ায় আসিয়াছিলেন, কে আসিয়া সংবাদ দিল তিনি যেন শীঘ্র আশ্রমে ফিরিয়া যান। পিতাজীর সহিত আমিও সেখানে গেলাম। রাত্রি তখন প্রায় ১০।১০॥। দেখিলাম সকলে উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্ণ। শ্রীশ্রীমা আশ্রমের সীমা হইতে বাহির হইয়া ময়দানে বসিয়া রহিয়াছেন। শুনিলাম সেদিন ভোরে যে মা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, এতক্ষণ দিন রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়াছেন। পিতাজীকে দেখিয়াই মা বলিলেন—"এ শরীরের বাবার সহিত কিছুদিন বেড়াইয়া আসি, তুমি আশ্রমে থাক।" পিতাজী অনেক প্রতিবাদের পর হঠাৎ "আচ্ছা" বলিয়া সম্মতি দিলেন। অনেকে মার সহিত রেল ষ্টেশনে গেল। আমিও পিতাজী আশ্রমে রহিলাম। পরে আমরাও ষ্টেশনে গেলাম। পিতাজী অনেক বিরক্তির সহিত মার সঙ্কল্প ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। মা কিন্তু একেবারে স্থির।

তখন মৈমনসিংহের গাড়ী ছাড়িবার বেশী দেরী নাই। মা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন পিতাজী আমাকে মাঁর সঙ্গে যাইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, মা যদি নিষেধ করেন, আমি যেন গাড়ীর অন্য কামরায় উঠিয়া পড়ি। তদনুযায়ী আমিও মার সঙ্গে রওনা হইলাম। রাত্রিতে যখন হঠাৎ এরূপ ভাবে এক বস্ত্রে আমি মৈমনসিং যাত্রা করিলাম, তখন প্রাণের ভিতর কি দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তা বলিবার নয়। সূর্য্য যে কর্ম্মদেব ইহা খুব সত্য, প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আফিসের ও পারিবারিক কত কর্ত্তব্যের ঝঙ্কার মনে উঠিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষের কি দুর্গতি! সংসার শৃঙ্খলের কি অটুট নিগড় বন্ধন! যাঁর পদধূলির ঈষৎ স্পর্শের জন্য বৎসরের পর বৎসর প্রাণ অহরহ আকুল, যিনি যমের হাত হইতে আমাকে ছিনাইয়া লইয়াছেন আজ তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিবার সুযোগ পাইয়াও মন নিরানন্দে ভারাক্রান্ত। বোধ হইতে লাগিল, আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা কেবল সাময়িক উচ্ছ্বাসের খেলা মাত্র, আমরা প্রকৃতপক্ষে ভোগ বাসনারই সেবক। মাও তাই বলিয়া থাকেন,—"তোদের ভক্তি, ভালবাসা তো শরীরের উপর বাতাসের মত খেলিয়া বেড়ায়, অন্তরের অমৃত কোষাগার খুলিতে না পারিলে আসল জিনিষ কোথা হইতে দিবি?" মৈমনসিং ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় যাইবেন?" মা বলিলেন,—"পাহাড়ের

দিকে।” আমি বলিলাম—“সামনে বিষম বর্ষা আসিতেছে, বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে নিয়া পাহাড়ে যাওয়া কি ঠিক হইবে? আপনি একান্তে থাকিতে চান, চলুন কক্সবাজার সমুদ্রতীরে যাই।” মা নীরব রহিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, মা কোন কথাই একবারের বেশী বলেন না। যখন যা আদেশ বা ইঙ্গিত আসে তখন তাহা বিনা প্রতিবাদে, অবনত মস্তকে অক্ষরে অক্ষরে আমাদের মানিয়া নেওয়া উচিত। নতুবা ভাবিফল অনেক সময় খারাপ হয়। নিজেদের ভিতর নানা বুদ্ধি বিবেচনার পর বিকালের গাড়ীতে কক্সবাজার যাত্রা করিলাম। আশুগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে হঠাৎ বৃষ্টি বাতাস কতক্ষণ ধরিয়া চলিল। মা বলিলেন, “এ কি দেখিতে-ছিস্? কাল আরও দেখবি।” পরদিন চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াই কক্সবাজারের ষ্টীমারে উঠিলাম। ষ্টীমার নদীমুখে সমুদ্রে যখন পড়িল, খুব ঝড় উঠিল; জাহাজ খুব দুলিতে লাগিল; জাহাজের উপর দিয়া ঢেউয়ের জল গড়াইয়া যাইতে লাগিল। যাত্রীরা ভয়ে চীৎকার করিতেছে, কান্নাকাটি করিতেছে। কিন্তু মায়ের আনন্দ দেখে কে?

সমুদ্রের খেলা দেখিয়া মা বলিলেন,—“দেখ্, কেমন অবিরাম কীর্ত্তন চলিতেছে, ভক্তি সাধনার দ্বারা যদি মানুষ উন্নত হইতে চায় তবে এরূপ অখণ্ডভাবে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন চাই।”

কক্সবাজার হইতে আদিনাথ গেলাম। আমি ঢাকা

ফিরিয়া আসিলাম। মা তথায় রহিলেন। কিছুদিন পরে পিতাজী আসিয়া আদিনাথ হইতে মাকে কলিকাতা নিয়া গেলেন। সেখান হইতে মা তাঁহার বাবার সহিত হরিদ্বার চলিয়া যান।

পরে সহস্রধারা (দেরাছুন), অযোধ্যা, বেনারস, বিন্ধ্যাচল, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানাস্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিয়া পিতাজীর সহিত একত্র হইয়া চাঁদপুর গেলেন। তখন মার সহিত কলিকাতায় আমার সাক্ষাৎ হয়। শুনিলাম, মা অনেকদিন পর্য্যন্ত নিজের ভাবে মাটিতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকেন, সামান্য কিছু ফল ও সরবৎ খান। আমিও দেখিলাম তিনি যেন কলের পুতুলের মত কোনরূপে নিস্তেজ জড়পিণ্ডবৎ দেহটি নিয়া চলাফেরা করিতেছেন। মার তখনকার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে ভগবান যখন দেহধারী হন, তখন তাঁহাকেও মানুষের ন্যায় মায়া-জগতের খেলার অধীন হইয়া চলিতে হয়।

কিছুদিন পরে মা ও পিতাজী চাঁদপুর হইতে ঢাকা আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী আসনে রহিলেন। পিতাজী অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিনি অনেক ভুগিয়া একটু সুস্থ হইতে না হইতেই মা একেবারে মারাত্মক ভাবে শয্যাশায়িনী হইলেন। মার এ পীড়া সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রমনা আশ্রমে টিনের

একটি একচালা করিয়া ৺ কালীমূৰ্ত্তি তথায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে এক রাত্রিতে চোর প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের হাত মোচড়াইয়া সোনার গহনাদি খুলিয়া লইয়া যায়। ভগ্নমূৰ্ত্তি পূজা হইতে পারে না এই কথা উঠিলে, নানাস্থানে পণ্ডিতের ব্যবস্থার জন্য লিখা হয়। পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন ভগ্ন-বিগ্রহের পূজা শাস্ত্রে নিষেধ আছে বটে, কিন্তু এস্থলে দেখা যাইতেছে যে কোন এক বিশিষ্ট মহা-পুরুষের অনুজ্ঞায় নৈমিত্তিক পূজার পরও ৺ কালীমূৰ্ত্তি বিসর্জ্জন না করিয়া, ইঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কাজেই তিনি যেরূপ বিধান করেন তদনুযায়ী চলা আবশ্যক। মার আদেশে সে মূৰ্ত্তিরই সংস্কার করিয়া পূজা হইতে লাগিল।

ইহার পূর্ব্বে মাকে আমি প্রায় নিবেদন করিতাম যে আশ্রমে কালীমূৰ্ত্তির জন্য একটি মন্দির চাই। তাহাতে মা হঠাৎ একদিন বলিয়াছিলেন—"এক বৎসর অপেক্ষা কর। ঠিক ঐ সময়ের ভিতর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথমে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমান ভূপতিনাথ মিত্রের বিশেষ উৎসাহে ও পরিশ্রমে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মন্দিরের ভিঁটি খুঁড়িতে দেখা গেল যে বসা এবং শোয়া অবস্থায় ৪।৫ টি বড় ও ছোট সমাধি রহিয়াছে। এ সমাধিগুলির সম্বন্ধে মা একদিন বলিয়াছিলেন—"এখানকার সারা জায়গাটি অতি পবিত্র, পূর্ব্বে ইহা সন্ন্যাসীদের স্থান ছিল। তুইও

তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমি ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন মহাপুরুষকে রম্‌নার মাঠে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। সাধুদের নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তাঁহাদের সমাধিতে মন্দিরাদি স্থাপিত হউক এবং তাহাতে দেবতার নিত্যপূজা, সাধন ভজনাদির দ্বারা এই স্থানটি জনসাধারণের ধর্ম্মভাবের সহায়ক হইয়া পবিত্রতা রক্ষা করুক। তাই আজ এখানে এ সমুদয় কাজ হইতেছে। যাহারা এই অনুষ্ঠানের সম্পর্কে আসিয়াছে এবং আসিবে সকলেরই ঐ সকল মহাপুরুষদের সঙ্গে কোন না কোন বন্ধন ছিল জানিস্।" মাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"যদি কোন জন্মে সন্ন্যাসী হইয়া থাকি তবে আজ এ অবস্থা কেন?" মা তাহাতে বলিয়াছিলেন—"যাকে দিয়া যে কাজ করান আবশ্যক, কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে তদ্রূপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়।"

আশ্রম হইবার পূর্ব্বে শাহ্‌বাগে মার থাকা কালীন প্রায় সন্ধ্যায়ই কীর্ত্তন হইত এবং উহা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রাত্রিতে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া চলিত। একদিন পূর্ণিমা রাত্রিতে নিজের ঘরে শুইয়া আছি, তখন প্রায় ১১ টা; আমি বেশ জাগ্রত। অনেক ক্ষণ ধরিয়া কানের কাছে মধুর ধ্বনি আসিতে লাগিল 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। আমার মনে হইতে লাগিল আজ বোধ হয় কীর্ত্তনে মা ঐ পদটি গাহিতেছেন। তারপরদিন খবর নিয়া জানিলাম যে সত্য সত্যই মা—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে"—

এ পদটির কেবল প্রথম অংশটুকু গাহিয়াছিলেন। কিন্তু কি দূরদৃষ্ট? ঈদৃশ কৃপাময় আকর্ষণ সত্ত্বেও কীর্ত্তনের জন্য প্রীতি আসিত না। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি ও ৺নিরঞ্জন শাহ্‌রাগে গিয়াছি। কীর্ত্তন হইল। মা আদেশ করিলেন—"আজ যাহারা কীর্ত্তনে যোগদান কর নাই, তাহারা সকলে নাম কর।" আমি ও ৺নিরঞ্জন অন্যান্য সকলের সঙ্গে লজ্জা ও সঙ্কোচের সহিত অস্পষ্ট স্বরে নাম করিলাম, কিন্তু মা'র আদেশ যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইলাম না বলিয়া আমার বিশেষ অনুতাপ হইতে লাগিল। হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—"আজ ত শনি-বার, কাল রবিবার, তোমরা সকলে বসিয়া রাত্রে কীর্ত্তন করনা কেন?" ৺নিরঞ্জন বাড়ীতে ফিরিয়া গেলে, আমি তথায় সারারাত্রি কীর্ত্তনে কাটাইলাম। শেষ রাত্রিতে মা প্রভাতী স্বরে গাহিলেন—"হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি-বোল।" আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা জাগিল। সেদিন হইতে আমার প্রতীতি জন্মিল যে সাধন ভজনে কীর্ত্তনের স্থান কোন অংশে অন্যান্য উপায় হইতে কম নয়। বর্ত্তমানে আশ্রমে যে শনিবারের কীর্ত্তন হয় উক্ত রাত্রিতেই ১৯২৬ সনের নবেম্বর মাসে উহার প্রথম আরম্ভ। সেদিন রাত্রে হরিনামের সঙ্গে মা-নামও যুক্ত হয়। তার কিছুদিন পরে সপ্তাহের প্রতিদিন এক একজনের বাড়ীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শাহ্‌বাগে কীর্ত্তনের সময় 'হরিবোল' কীর্ত্তনই বেশী হইত। অনেক সময় আমার মনে আসিত যে সকলের সকল ভাবে এখানে 'মা'ই যখন লক্ষ্য, মা' নামে কীর্ত্তনই তো সঙ্গত। কাহাকেও কাহাকেও ইহা বলিলাম, কিন্তু কেহই এ কথায় মনোযোগ দিলেন না। আমি নিজে কীর্ত্তন করিতে পারিনা। কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। শ্রীমান অনাথবন্ধু, ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত প্রভৃতি আশ্রমে যোগ দিলে তাহাদিগকে বলিলাম,—"ধীরে ধীরে কীর্ত্তনে মা নাম আনিবার চেষ্টা কর।" শ্রীযুক্ত কুলদা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তখন শাহ্‌বাগে নূতন আসিয়াছেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পূজা যোগাদি অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ; তিনিও মা নাম কীর্ত্তন সঙ্গত হইবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যা'হোক হরি ও মা নাম মিলাইয়া কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। মানুষের সংস্কারজ অভ্যাস ত্যাগ সহজ নয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মানুশীলনে দশ জনের সঙ্গে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চলা আমাদের অধিকাংশের স্বভাব। যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম করিতে মনে আশঙ্কাও হয়।

তখন আমি ভাবিতাম ধ্যানে রহিল মায়ের ছবি। মন মায়ের পদরেণু স্পর্শ করিবার জন্য উদগ্র, চোখের উপর মায়ের মূর্ত্তি ভাসিয়া রহিতেছে। মার কথা শুনিবার জন্য প্রাণ আকুল। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তির ধারা তাঁর শ্রীচরণ-মুখে ছুটিতেছে, আর কীর্ত্তনের সময় যদি "প্রাণগৌরাঙ্গ

নিত্যানন্দ” কিম্বা “এস হে গৌর, বস হে গৌর, আমার হৃদয় প্রাঙ্গণে,” এইরূপ কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দিই তবে আমাদের চিত্তগতির সহিত কীর্ত্তনের সুরের সঙ্গতি হইতেই পারে না।

পূজা বা ধ্যান ধারণার মত কীর্ত্তনাদিরও একমাত্র উদ্দেশ্য ভাবে ডুবিয়া চিত্তবৃত্তিকে একমুখী করা—সকল বহুমুখী বাসনা কামনাকে একতানে আরাধ্য দেবতার দিকে উদগ্র করিয়া তোলা। তখন আমার প্রায়ই মনে হইত বিবিধপদাবলীর বিচিত্র ভাব ও সুরের বিলাসে মন প্রাণকে সরস করিয়া তোলার চেষ্টা না করিয়া যাঁর দিকে চিত্ত স্বতঃই আকৃষ্ট হইতেছে গানের ভাব ও সুরের গতি যদি সেই এক লক্ষ্যে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া যায় ভজনকীর্ত্তনের মধ্যে প্রাণ আসিবে এবং আমাদের চিত্ত একটি পরম আশ্রয়স্থান লাভ করিতে পারিবে।

যদি আমরা একনিষ্ঠ মাতৃসেবক হইতে পারি তবে এক মা নামের কীর্ত্তনের সুরেই সব সাধু সজ্জনের পদাবলীর ভাব ও সুরের সকল ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। মা শব্দ তো সকল মানবের আদি নিত্যশব্দ। জন্মের সঙ্গে এই বাণী প্রথম মানবমুখে উদ্গত হইয়া থাকে এবং যতদিন জীব বাঁচিয়া থাকে শ্বাসে ওঁম্ (ওঁয়া বা মা শব্দেরই রূপান্তর) এবং প্রশ্বাসে “মা” সকলে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি। বিশেষত এই “মা” নাম সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের পরম সম্পদ।

যদি আমরা মাকে জগৎ-জননী বলিয়া সত্যই মনে

করিয়া থাকি তবে "মা" নামের কীর্ত্তনই আমাদের স্বাভাবিক সহজ সাধনা হওয়া উচিত।

এই সময় কীর্ত্তনের মধ্যে প্রথম "মা" নাম যুক্ত করিয়া দিয়া আমি একটি গান রচনা করি। তাহা এইখানে উদ্ধৃত হইল :—

হরিষে বিষাদে কিবা সুখে দুঃখে
ডাক মা, মা, মা, মা, মা,
মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা মা
মাতৃ-গর্ভ হ'তে যখনি পড়িয়া
নিল তুলি কোলে জননী আসিয়া
করিল দীক্ষিত মন্ত্রে ওঁয়া
ডাকিতে শিখিলে মা মা মা।
আপনাতে ভর করিয়া আপনি
গিয়াছ ভুলিয়া সেই আদি ধ্বনি
তাই বেদতন্ত্রে বেড়াও খুঁজিয়া
অসীম অনন্ত সীমা।
যদি হিয়া তত্ত্ব বুঝিবারে চাও,
নামরূপ সুর মা বীজে ডুবাও
ভাস আঁখিজলে মা মা মা বলে
কর পথের সম্বল শ্রীআনন্দময়ী মা।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে আমি গিরিডিতে ছিলাম, পিতাজী ও মা হঠাৎ একদিন তথায় পদার্পণ করিলেন।

আমি তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলাম সকল আশ্রমের মতো আমাদের আশ্রমেও কীর্ত্তনের একটি বিশেষ বাঁধা নাম থাকা প্রয়োজন। আশ্রমের সকল চিন্তা ও কর্ম্মধারা যাঁকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে, সাধনের, কীর্ত্তনের সুরও তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া গেলে সাধন প্রচেষ্টায় জোর বেশী হইবে। হরি ও মা নাম সংযোজিত করিয়া নানা রকম পদ তৈয়ারি হইল, উহার একটি ঢাকায় কুলদা দাদার নিকট পাঠানো স্থির হইল। মা চলিয়া গেলে উহা ঢাকায় পাঠাইব, এমন সময়, আমার প্রাণে কি এক প্রবল ভাবের উদয় হইল, কেবল মা নাম* দিয়া এক নূতন পদ তৈয়ারী হইয়া গেল :—

মা মা মা মা মা মা মা
ডাক মা মা মা মা
বল মা মা মা মা
গাও মা মা মা মা
ভজ মা মা মা মা
জপ মা মা মা মা
ডাক, বল, গাও, ভজ, জপ মা মা মা ॥

---

* যেমন এক সুর হইতেই সা, রে, গা, মা, ইত্যাদি সপ্ত বিভাগ তদ্রূপ মাকে লক্ষ্য করিয়া উপলক্ষ্য করিয়া মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা, এই সাত শব্দে কীর্ত্তনের পদ রচিত হইয়াছে। অভ্যাসে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে একই লক্ষ্যে, এক ধ্বনির আশ্রয়ে চিত্তকে সমাহিত করিতে হয়। তখন ভাবোন্মাদনা সহজ হয়; সেই একই ধ্বনির স্পন্দনে সমগ্র দেহের ও মনের স্পন্দনের ঐকতানতা জন্মে।

ইহা ঢাকায় কুলদা দাদার নিকট পাঠানো হইলে তিনি লিখিলেন যে পদটি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইহাই হইল মা কীর্ত্তনের প্রথম সূত্রপাত। অভাব না হইলে মানুষ প্রকৃতভাবে আসিতে পারে না। যখন উপরোক্ত কীর্ত্তনের পদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন কয়েক মাস ধরিয়াই মা ঢাকার বাহিরে ছিলেন, কাজেই বিয়োগ-বিধুর ভক্তের প্রাণে মধুর মা ডাকের মধুরতা প্রাণের অন্তস্থল পর্য্যন্ত সাড়া দিয়াছিল।

যখন রমনা আশ্রম তৈয়ার হইল মার মুখ নিঃসৃত পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্তের পদগুলি প্রত্যহ কীর্ত্তনের পূর্ব্বে ভজনের মত গান করা হইত। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের) অগ্রহায়ণমাসের শেষাশেষি মা একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"এ স্তোত্রটি অসম্পূর্ণ, আর কোন ভজনের ব্যবস্থা করিতে পারিস্ না কি?" আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম; ভাবিতে লাগিলাম সংস্কৃতে কতই না স্তব স্তুতি আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ভজন বাঙ্গলা ভাষাতেই শুনাবে ভাল। কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের কল্যাণময় ঈঙ্গিতে হঠাৎ শেষ-রাত্রি ৩টার সময় এক প্রেরণা আসিল—অমনি নিম্ন-লিখিত ভজনটি মায়ের কৃপায় রচিত হইয়া গেল:—

ভজন

(১)

(জয়) হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী (শ্রী) আনন্দময়ী মা।
ভুবনউজলা জননী নির্ম্মলা পুণ্যবিস্তারিণী মা॥
রাজরাজেশ্বরী স্বাহা স্বধা গৌরী প্রণবরূপিণী মা॥
সৌম্যাসৌম্যতরা সত্যা মনোহরা পূর্ণপরাৎপরা মা॥
রবিশশিকুণ্ডলা মহাব্যোমকুন্তলা বিশ্বরূপিণী মা।
ঐশ্বর্য্যভাতিমা মাধুর্য্যপ্রতিমা মহিমামণ্ডিতা মা॥
রমামনোরমা শান্তি শান্তা ক্ষমা সর্ব্বদেবময়ী মা।
সুখদা বরদা ভকতিজ্ঞানদা কৈবল্যদায়িনী মা॥
বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বপালিনী বিশ্বসংহারিণী মা।
ভক্তপ্রাণরূপা মূর্ত্তিমতী কৃপা ত্রিলোকতারিণী মা॥
কার্য্যকারণভূতা ভেদাভেদাতীতা পরমদেবতা মা।
বিদ্যাবিনোদিনী যোগিজনরঞ্জিনী ভবভয়ভঞ্জিনী মা॥
মন্ত্রবীজাত্মিকা বেদপ্রকাশিকা নিখিলব্যাপিকা মা।
সগুণা সরূপা নির্গুণা নীরূপা মহাভাবময়ী মা॥
মুগ্ধ চরাচর গাহে নিরন্তর তব গুণ মধুরিমা।
(মোরা) মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি (শ্রী) চরণে জয় জয় জয় মা॥

ডাক মা মা মা মা মা মা মা,
বল মা মা মা মা মা মা মা,
গাও মা মা মা মা মা মা মা,
ভজ মা মা মা মা মা মা মা,
জপ মা মা মা মা মা মা মা,
ডাক মা মা মা মা মা মা মা,
মা মা মা।

১১ই পৌষ, ১৩৩৬ রমনা, ঢাকা

শ্রীশ্রীমা [১৩৭ পৃষ্ঠা

নবজীবনের পথে

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন-সৌভাগ্যের পর হইতেই সংসারের অগণ্য বিক্ষেপ ও বিক্ষোভের মধ্যেও নিত্যানন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তির সরল স্নিগ্ধদৃষ্টি আমাকে পাগলের মত সর্ব্বদা আকুল করিয়া রাখিত। তাঁহার কৃপাবিন্দুর জন্য হৃদয়ে অবিরাম উৎকণ্ঠা জাগ্রত থাকিত। আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত মহাসাগরের তরঙ্গ কোলাহলের মত আমার প্রাণের মধ্যেও মায়ের শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া গভীর উচ্ছ্বাস দিনরাত্রি শোঁ শোঁ রবে ধ্বনিত হইত। কখনও কখনও মা মা রবে কিছুক্ষণ চীৎকার করিতে পারিলে প্রাণে কতকটা শান্তি বোধ করিতাম। কিন্তু প্রথমে আমার সেরূপ সুযোগও কম ছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলমূর্ত্তিতে নানাবিধ ভাব দেখিয়াছি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমি বিস্ময়ে ও হর্ষে কুঞ্চিত হইয়া পড়িতাম। আমার তখন মনে হইত আমি একটি শিশু বা দীনাতিদীন ভিখারী, তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তখন আমি কখনো মায়ের পদতলে বসিতে পারি নাই, কিছু দূরে দাঁড়াইয়াই থাকিতাম। প্রায়ই প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ জনিত সৌভাগ্য সর্ব্বপ্রথমে আমারই ঘটিত, কেননা অত প্রত্যূষে খুব কম লোকেই আশ্রমে যাতায়াত করিত। কোন কোন দিন দেখিয়াছি,

ঘুমন্ত চোখে ঢুলুঢুলুভাবে মা বিছানার একপাশে নিদ্রালস ভাবে বসিয়া আছেন, কখনো বা তাঁহার চিরহাস্যমধুর চোখ মুখ হইতে বাৎসল্য ও করুণার ধারা যেন অজস্র চারিদিকে ছড়াইয়া যাইতেছে, কখনো কখনো উদার প্রসন্নতার অনাবিল প্রসারে তিনি শরতের আকাশের মতো নির্ম্মল হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপের পার্থক্য সর্ব্বদা লক্ষিত হইত। কখনো বা বৃদ্ধার মত তাঁহাকে দেখাইত। কখনো বা অজস্র হাসিখেলার প্রাচুর্য্যের মধ্যে হঠাৎ অচল, অটল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভীতিকর মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়া পড়িত। শেষোক্ত অবস্থার সময় দেখা যাইত মায়ের শরীর বিপুল স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে, এবং রুদ্রাণীর মতো এক দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। সে সময় তাঁহার সেই অট্টহাসি, ঘুর্ণিত চক্ষু, হস্তপদাদির পরিচালনাভঙ্গী যে দেখিয়াছে সেই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই তাঁহার স্বতোৎসারী প্রশান্ত মূর্ত্তি ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু সকল সময়েই মায়ের আকর্ষণ আমি তখন নিবিড় ভাবে অনুভব করিতাম যে তাঁহার নিকটে আসিতে না পারিলে কিছুই আমার ভাল লাগিত না; কেবল কতক্ষণে ছুটিয়া গিয়া মায়ের পদতলে আশ্রয় নিতে পারিব মনের ভিতর এই ঐকতান ধ্যান চলিত। আমার বোধ হইত তিনি যেন সকল সময়ে—"আয়, আয়," বলিয়া আমার অন্তরাত্মকে আহ্বান করিতেছেন, সকল সময় যেন তিনি আমার মুখের

দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছেন। অনেকদিন কল্পিত দৃঢ়তার সহিত তাঁহার চিন্তা চিত্তপট হইতে সরাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তিনি আমার সকল বিরুদ্ধ ইচ্ছা-শক্তিকে উপহাস করিয়া মন-বুদ্ধিকে অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। আমি হয়রাণ হইয়া জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকিতাম। মাতৃভাবের এই প্রাণগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতাম না। এইরূপে দুর্ব্বল শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে লাগিল।

অবশেষে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী "আমি আর পারি না" বলিয়া শরীর শয্যা গ্রহণ করিল। রোগের প্রারম্ভে বুকের মধ্যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম। কোন ঔষধেই তাহার উপশম হইল না। মা একদিন দেখিতে আসিয়া, আমার বুকে তাঁহার হাতখানি রাখিলেন, সকল জ্বালা যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে রোগের তীব্রতা বাড়িতে লাগিল। ডাক্তারেরা বলিল, আমার যক্ষ্মা রোগ দাঁড়াইয়াছে। মা পরে এক রাত্রিতে আসিলেন, আমার শয্যার নিকট বসিয়া আপন মনে কি কি বলিলেন। বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম তিনি রোগের মূর্ত্তিটিকে বলিয়াছিলেন,—"যা করিবার তো করিয়াছিস্, এইখানেই এখন থামিয়া যা।" তখন হইতে মা আমাকে দর্শনদান বন্ধ করিলেন। নিতান্ত শোচনীয় মুমূর্ষু অবস্থায়ও কয়েক মাস তাঁহার শ্রীচরণ সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

ইহারও দরকার ছিল। কারণ তাঁহার অভাবজনিত নিদারুণ ব্যাকুলতা আমার দারুণ রোগযন্ত্রণাকে অনেক প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার লক্ষ্য সর্ব্বদা মার চরণে ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকিত বলিয়া, তিনি সর্ব্বময়ী হইয়া আমার ভিতরে বাহিরে বিরাজিতা ছিলেন। একদিন শাহ্-বাগে বসিয়া মা দেখিলেন, সকলের মুখেই যেন রক্ত। পিতাজী একথা শুনিবামাত্রই রাত্রে আমাকে দেখিতে আসিলেন; তখন আমার রক্তবমন হইতেছে, আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এমন অনেকদিন গিয়াছে যখন মা শাহ্‌বাগে বসিয়া কোন খবর পাইবার পূর্ব্বে আমার তখনকার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা জানাইয়া দিতেন।

এক রাতে আমার অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল। ডাক্তারেরা বলিল, আমার জীবনের আশা কম। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা; বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামিয়াছে, চারিদিকে কুকুরগুলি চীৎকার করিতেছে। বিষম বিভীষিকায় আমার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিতেছে। আমি দেখিতেছি প্রত্যক্ষ মা যেন আমার শিয়রের ডান দিকে বসিয়া রহিয়াছেন, আমি মাকে ঐ সময় দেখিয়া বিস্মিত হইতেই মা যেন আমার মাথায় হাত রাখিলেন। তখন হইতে ৮।১০ মাস পর্য্যন্ত যতদিন আমি শয্যাগত ছিলাম সর্ব্বক্ষণই বোধ করিয়াছি যে মা আমার শিয়রে ধীর স্থির ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি আমাকে মৃত্যুর হাতে ছাড়িয়া দিবেন না। কখনো কখনো ঘণ্টার

পর ঘণ্টা কাসির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম, তখন মার নাম জপ করিতে করিতে সকল উপদ্রব দূরীভূত হইয়া যাইত। ইহার ভিতর মার এক খেয়াল হইল, আমাকে উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীমান যোগেশচন্দ্রকে এক বৎসরের জন্য গৃহহীন অবস্থায় ও ভিক্ষান্নে অতিবাহিত করিবার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন।

কয়েক মাস পরে আমি শাহ্‌বাগের নিকট গবর্ণমেণ্টের এক বাড়ীতে আসি। মা তখন কুম্ভের মেলায় হরিদ্বার চলিয়া আসেন। আমার অবস্থা আবার খারাপ হইলে মার নিকট হৃষিকেশে এক টেলিগ্রাম যায়। মা আসিলেন না। পরে শুনিয়াছি টেলিগ্রাম পাইয়া পিতাজী যখন ব্যস্ত হইলেন, মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আমি তো দেখিতে পাইতেছি সে আমার কোলে নিশ্চিন্তে শুইয়া রহিয়াছে।"

রোগের প্রায় পাঁচ মাস পরে ইনজেক্‌শান্ ইত্যাদিতে কিরূপ শক্তিলাভ করিয়াছি দেখিতে গিয়া দেওয়াল ধরিয়া ঘরের মধ্যে দু' এক মিনিট চলিতে চেষ্টা করি। তাতে সন্ধ্যায় মুখ দিয়া রক্ত পড়ে। ডাক্তার ইহা শুনিয়া আমাকে একেবারে বিছানায় শুইয়া থাকিবার জন্য বলিয়া যায়, এবং এই নিয়ম যাহাতে রক্ষা হয় সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক করিয়া যায়।

উক্ত ঘটনার ৪।৫ দিন পরে মা ঢাকায় ফিরিলেন, এবং আমাকে দেখিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন

আছিস ?” আমি বলিলাম—“অন্য কোন উপদ্রব বিশেষ বোধ করি না, তবে অনেকদিন ধরিয়া স্নান না করাতে বড় অস্বস্তি লাগে।” তখন বৈশাখ মাস। খুব গরম। মা কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন বেলা একটার সময় আসিলেন। তখন বাড়ীর সবাই নিদ্রিত। আমার ১১৷১২ বৎসর বয়স্কা মেয়েটি আমার বিছানার নিকট ঘুমাইতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন,—“তুই স্নান করিতে চাহিয়াছিলি—যদি স্নান করিতে হয় তবে ঐ যে পুকুরটি আছে তাহাতে স্নান ক’রে আয়।”

ঐ পুকুরটি আমার বাড়ী হইতে প্রায় ৬০৷৮০ গজ দূরে। মার কথা কাণে পৌঁছিবামাত্রই শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে আমার শরীরে এক অভিনব শক্তি জাগিয়া উঠিল। শরীরে ত হাড় কয়খানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তার উপরে ডাক্তারের আদেশ শয্যাত্যাগ না করা। এই অবস্থায় আমি বিছানা হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া কাপড় হাতে করিয়া স্নানের জন্য চলিতেই পিতাজী আমাকে ধরিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুকুর পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। ঘরেব ভিটি প্রায় ৩৷৪ হাত উঁচু ছিল। ধাপ দিয়া নামিয়া সমস্ত পথ হাঁটিয়া গেলাম। পুকুরটি রিজার্ভ পুকুর ছিল, ইহার এক পাড়ে ইউনিভারসিটি মুসলমান বোর্ডিং। কিছুদিন পূর্ব্বে পি, ডব্লিউ, ডি এক নোটিশ দিয়াছিল যেন ঐ পুকুরে কাপড়াদি কাচা না হয়। সেদিন সে বোর্ডিংয়েও কাহাকেও দেখা গেল না, বাড়ীতেও

সকলেই নিদ্রামগ্ন। পুকুরে নামিয়া খুব আনন্দে স্নান করিলাম বাড়ীতে ফিরিয়া ভিজা কাপড়খানি দড়ির উপর মেলিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। আমি শুইতে না শুইতেই মেয়েটি জাগিয়া দেখিতে পাইল, মা তাহার গায়ের কাছে বসিয়া আছেন। স্নান করিবার জন্য যাইতে মাঠে অনেক চোর কাঁটা কাপড়ে লাগিয়াছিল; কাপড় তুলিবার সময় খগা তা' দেখিতে পাইয়া আমার স্ত্রীকে বলে। তিনি কাপড়খানি হাতে করিয়া মাকে বলিলেন যে ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চয়ই আমি দুপুরে মাঠে মাঠে ঘুরি। মা হাসিতে লাগিলেন, কিছুই ভাল মন্দ বলিলেন না। কি এক অনির্ব্বচনীয় অলক্ষ্য শক্তিতে পরিচালিত হইয়া আমি পুকুরে যাওয়া আসা ও ডুব দিয়া স্নান করিলাম এবং দিনে দুপুরে লোক-চক্ষুর অন্তরালে কি অচিন্ত্যনীয়রূপে এ ঘটনা ঘটিয়া গেল, আমি ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। ৩।৪ মাস পরে যখন হাওয়া পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ঢাকা ত্যাগ করি ৺নিরঞ্জনের নিকট এই কথা প্রথম প্রকাশ করি। পরে চাকরীতে হাজির হইয়া ডাক্তারদের এই কথা বলাতে তাঁহারা বলিলেন—'এ হ'তেই পারে না।' স্ত্রীরও অনুরূপ ধারণা হয়। আমার কাপড়ে চোর কাঁটার প্রসঙ্গ করাইয়া দেওয়াতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে।

রোগের কঠিন অবস্থায় আমার একবার ভাত খাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মে। ডাক্তারেরা নিষেধ করেন। ৺নিরঞ্জন

গিয়া মাকে বলে—"মা, জ্যোতিশ ত ভাত খাইতে চায়, ডাক্তারেরা নিষেধ করে, যদি তাহার দেহত্যাগ হয়, তবে বড় দুঃখ থাকিয়া যাইবে যে তার মুখে দুটি অন্ন দেওয়া গেল না।" মা হাসিয়া বলিলেন—"তোমার যখন এরূপ ইচ্ছা, তাকে ভাত খাওয়ানো হইবে।" ইহার পরে একদিন পিতাজী শাহ্‌বাগ হইতে আসিয়া সকলের আড়ালে আমাকে ডাল ভাত খাওয়াইলেন!

একদিন প্রাতে ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত আমাকে কতকগুলি চাঁপাফুল আনিয়া দিল। তখন মা প্রত্যহ আমাকে একবার দেখিয়া যাইতেন। সেদিন খুব ভোরে আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চাঁপা ফুলগুলি দেখিয়া আমার দুঃখ হইল যে উহা মায়ের চরণে অর্পণ করিতে পারিলাম না। বিকালে কুলদা দাদা একটি সুন্দর গোলাপ লইয়া উপস্থিত। এই ফুলটিও মাকে দিতে পারিলাম না বলিয়া মনে বড় দুঃখ বোধ হইতে লাগিল। টেবিলে চাঁপাফুলের উপর গোলাপটি রাখিয়া দেওয়া হইল। এমন সুন্দর ফুলগুলি মায়ের শ্রীচরণে পড়িল না, এই ব্যথায় মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইতেছি ঠিক এমম সময় মা হঠাৎ বাহির হইতে ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া সোজাসুজি টেবিলের নিকট গিয়া ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন; বড় উন্মনাভাবে ৩।৪ মিনিট আমার দিকে একদৃষ্টে দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, টেবিলের উপর ফুলগুলি মা গ্রহণ

করিয়াছেন। দেখি কি গোলাপ ফুলটি নাই। পরদিন মা আসিলে ফুলের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—। তিনি বলিলেন—"কি নিয়াছি, না নিয়াছি, জানিনা; তবে কিছু নিয়াছিলাম। প্রথমতঃ এখান হইতে ধানকোড়ার জমিদার বাড়ী যাই, তথাই একটি স্ত্রীলোক হাত পাতিলে তাকে কিছু দিই; সেখানে কীর্ত্তন হইয়া গেলে ফিরিবার পথে এক ডেপুটীর বাড়ী যাই; তথায় এক রোগিণী ছিল তাহার বিছানার উপর হাত হইতে আর কি ফেলিয়া আসি।" পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে প্রথম বাড়ীতে গোলাপ ফুলটি দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে একটি চাঁপাফুল পাওয়া গিয়াছিল এবং সে রোগিণী ব্যাধিমুক্তা হইয়াছিলেন।

এ প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন—"**আকুল ভাবই পূজা অর্চ্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির প্রস্রবণ এবং সকল চেষ্টাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল বিদ্যমান।**"

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। আমার রোগের সময় পিতাজী আদেশ করিলেন যে শাহ্‌বাগ হইতে প্রত্যহ আমার জন্য অন্নপ্রসাদ আসিবে। সেখানে ভোগ হইতে প্রায় মধ্যাহ্ন ১।২টা হইত। তারপর আমার বাড়ীতে ভোগ পৌঁছিতে আরো দেরী হইত। প্রসাদের অপেক্ষায় রোজ বেলা শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকা

সবাই বিরক্তির ব্যাপার মনে করিত। পূর্ণিমার ভোগ রাত্রিতে হয়। সেদিন প্রসাদের বিষয়ে আমার বাড়ীতে নানা বিরুদ্ধ কথাবার্ত্তা হয়। বড়দুঃখে আমার মনে হইতে লাগিল যে এত গোলমালের ভিতর প্রসাদের প্রয়োজন নাই। সে রাত্রে ২টা বাজিয়া গেল, প্রসাদ আর শাহ্‌বাগ হইতে আসেনা। আমি ভাবিলাম, সন্ধ্যার সময় প্রসাদ বাড়ীতে না আনার জন্য যে বিরুদ্ধভাব আমার ভিতর উদয় হইয়াছিল, তাহাতেই প্রসাদ বুঝি বন্ধ হইল। আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম। দেখি আধ ঘণ্টার ভিতরই প্রসাদ আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম ১১টার সময় প্রসাদ আনিবার জন্য মায়ের অনুমতি চাহিলে তিনি নিষেধ করেন। এইমাত্র মা বিছানা হইতে উঠিয়া আদেশ দিলেন, "শীঘ্র গিয়া জ্যোতিষকে প্রসাদ দিয়া আস"। তখন রাত্রি ৩টা। এ প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন—"আমি তো আর ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, তোরা তোদের ভাবেই হাসি কান্নার সৃষ্টি করিস্।"

আমি অসুস্থাবস্থায় পরিবর্ত্তনেব জন্য বিন্ধ্যাচল গেলাম। কলিকাতায় মার দেখা পাইয়া বিন্ধ্যাচল যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মা স্বীকৃতা হইলেন না। আমি বিন্ধ্যাচলে গিয়া একরাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভোর করিলাম। একদিন পরেই দেখি মা ও পিতাজী সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে মা বলিয়াছেন—'আমাকে' সরাইতে

পারিলে 'তোমাকে' পাওয়া যায়। সাধন-ভজনের লক্ষ্যই অহঙ্কার চুরমার করিয়া দেওয়া।"

বিন্ধ্যাচল হইতে আমি চুনার গেলে মাও সেখানে আসিলেন। আমাকে বলিলেন—"তুই বেড়াতে যাস্ তো?" আমি বলিলাম,—"শরীরে বল পাই না, কেমন করিয়া হাঁটিব?" মা তারপরদিন ভোরে আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইলেন। সমান জায়গায় ও পাহাড়ে ক্রমাগত ৫।৬ মাইল ঘুরিয়া বেলা ১১ টার সময় বাসায় ফেরা হয়। পাহাড় হইতে নামিবার সময় আমায় পা আর চলে না। মা পিছন ফিরিয়া বলিলেন—"আর বেশী দূর নাই।" তখন দেখি কি একার আড্ডা হইতে বহুদূরে এক অপ্রকাশ্য রাস্তায় দশ মিনিটের মধ্যে এক একা মিলিয়া গেল। নতুবা আরও এক মাইল আসিয়া গাড়ী ধরিতে হইত। আমার আশঙ্কা হইল এতদূর হাঁটায় রোগ বৃদ্ধি পায় নাকি। কিন্তু কোন উপদ্রব হইল না।

এ প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন—"কর্ম্ম ও ধর্ম্ম জগত উভয়ত্রই ধৈর্য্য প্রধান অবলম্বন।"

চুনারে আমার বাসার কিছুদূরে এক গাছতলায় রাত্রি ৯ টার সময় পিতাজী, মা ও আমি বসিয়া আছি। মা বলিলেন—চুনার ফোর্টের কূয়ার জলে তিনি স্নান করিবেন। এই বলিতে বলিতে তিনি ছেলে মানুষের মত আবদার করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—"বাড়ী হইতে চাকর

ডাকি।" মা বলিলেন—"না তা হইবে না।" মহা-চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। কারণ ঐ দেশে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে যার যা' দরকারী জল তুলিয়া নিয়া যায়। আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতে লাগিল যে মার আবদার বোধ হয় পূর্ণ করিতে পারিলাম না। এই বলিয়া কেবল তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলাম। দেখি কি একটি লোক লণ্ঠন হাতে কূয়া হইতে জল নিতে আসিতেছে। তাহাকে কাকুতি-মিনতি করিয়া জল আনাইয়া মাকে স্নান করাইলাম।

এই প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন—"চাহিলেই পাওয়া যায়, তবে মনে মুখে সর্ব্বভাবে এক করিয়া চাওয়া চাই।"

আমি পীড়িত অবস্থায় কিছুদিন গিরিডিতে বাস করি। একবার মাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় অস্থির হইল। দেখি কি একদিন ভোরে মা সদলবলে তথায় উপস্থিত!

এরূপে সর্ব্বদাই অজস্র অহৈতুকী করুণাধারা বর্ষণ করিয়া কতদিন কতভাবে সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমি কলিকাতা আসিলাম। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আর চাকরী করিয়া কাজ নাই। কোন ভাল স্থানে থাকিয়া যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করুন। তখনও কাসির সঙ্গে রক্তবমন হইত।

মা আদেশ করিলেন—"তুই যাইয়া পুনরায় কর্ম্মে হাজির হ'।" ঢাকায় আসিয়া প্রথম যেদিন আফিসে যাই মা

ও পিতাজী আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া চেয়ারে বসাইয়া আসিয়াছিলেন।

তখন ফিন্‌লো সাহেব বাঙ্গালার কৃষি বিভাগের ডিরেক্‌টার এবং আমার মনিব। তিনি আমায় খুব ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। আফিসের কাজকর্ম্মের কথায় তিনি বলিলেন—"তুমি যা' পার করিও, বাকী আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।" তিনি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা বল দেখি, এরূপ দুরারোগ্য রোগ হইতে তুমি কি করিয়া মুক্ত হইলে?" আমি বলিলাম—"রম্‌না আশ্রমে যে মাতাজী আছেন তাঁহারই কৃপায়। কোন ঔষধ বা তাবিজ, কবচ তিনি আমাকে দেন নাই। যদিও আমি ডাক্তারদের ব্যবস্থা মত চলিতাম, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দয়াদৃষ্টিই আমার একমাত্র সম্বল ছিল।" সাহেব আমায় বলিলেন—"অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। আমাদের ভিতরেও এরূপ কৃপার কথা শোনা যায়।"

এক সন্ধ্যায় প্রতিবেশী অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় আমার বাড়ী উপস্থিত। মায়ের প্রসঙ্গাদিতে তাঁহাকে বলিলাম,—"মার কৃপাতেই আমি এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কারও কৃপাতে কি কা'রো আয়ুবৃদ্ধি হতে পারে?" এই আলোচনার মাঝামাঝি তিনি হঠাৎ চুপ হইলেন এবং একটু পরে চলিয়া গেলেন। তারপর দিন প্রাতে আবার আসিয়া

আমায় বলিলেন—"কাল হঠাৎ এমনভাবে চলিয়া গেলাম কেন জানেন? যখন আমাদের বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন দেখি কি আপনার চেয়ারের দেওয়ালের গায়ে সূর্য্যের তীব্র জ্যোতির মত গোলাকার কি একটি আলো পড়িয়াছে। তখন বাহিরে অন্ধকার, ঘরেও আলো ছিল না, চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম, ঐখানে আলো পড়িবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে হইল, আপনাকে জানাইবার পূর্ব্বে নিজে একবার চিন্তা করিয়া দেখিব। গতরাত্রে ভাবিতে ভাবিতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে মহাপুরুষদের কৃপায় সবই সম্ভব। বাস্তবিকই আনন্দের বিষয় যে আপনার উপর মায়ের অসীম কৃপা এবং তিনি আপনাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন।"

মায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতের কয়েক মাস পরে ৺নিরঞ্জন একদিন শাহ্‌বাগে মাকে বলিয়াছিল—"মা, অনেক সময় মনে হয় আপনার আশ্রম হইলে আমি ও জ্যোতিষ মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারী হইয়া সে আশ্রমে থাকিব।" মা আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুই যে চুপ করিয়া রহিলি, এ শরীরে পারবি না?" ৩।৪ বৎসর পরে রোগমুক্ত হইয়া কর্ম্মে হাজির হইলে একদা আশ্রমে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া মা বলিলেন,—"দেখ্‌লি কেমন করিয়া তোর পুনর্জ্জন্ম হইল!" ইহার পরে মার গলায় একটি সোনার হার পৈতার মত ছিল, তাহা হাতে লইয়া বলিলেন—"এদিকে

আয়, আমি তোকে এই পৈতাটি পরাইয়া দিলাম, জানিস্ আজ হইতে তুই ব্রহ্মচারী।”

আশ্রমে মা যে কুঁড়ে ঘরটিতে থাকিতেন তাহার ভিঁটিটি আমিই আপন বুদ্ধিতে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম। একটি মাত্র কামরা দৈর্ঘ্যে ৮ হাত ও প্রস্থে ৫½ হাত; চারিদিকে বারান্দা; মা তাহার উভয় পার্শ্বে শুইতেন। মা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে এ আশ্রমে যে সব সন্ন্যাসী অতীত সময়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। বহুদিন পরে কথা প্রসঙ্গে কেবল তাঁহার শোয়ার জায়গাটুকু লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—“এ দেহ আসিবার পূর্ব্বেই তোর ভাব ও কর্ম্মের সমাধান ধারায় তুই এ স্থানটি করেছিলি।” মনে করিতে লাগিলাম আমার কত সৌভাগ্য; মা স্থূল শরীরে আমার জন্মান্তরের অধ্যাত্ম-কর্ম্ম-ভূমির উপর আসন পাতিয়া রহিয়াছেন। আমার তপস্যাও তাই ছিল। কারণ যেদিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন পাই সেদিনই আমার চোখে মা সর্ব্বদেবদেবীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতেই প্রায় তিন বৎসর মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আমি খুব ভোরে রম্না আশ্রমে যাইতে লাগিলাম। ইহার জন্য রাত্রিতে প্রায় ২টার সময় উঠিয়া নিত্যকর্ম্মাদি শেষ করিয়া ৪½টার সময় বাহির হইয়া পড়িতাম। কোন কোনদিন ঘড়ীতে মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটায় ভুল করিয়া পথে কাহারো বাড়ীতে ঘণ্টায় শব্দে বুঝিতাম

অনেক রাত্রি রহিয়াছে। তখন হয় রম্‌না পরিক্রমা করিতাম, না হয় রম্‌নার কালীবাড়ীর দুয়ারে বসিয়া ভোরের আলোর জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। প্রায় ৫টার সময় আশ্রমে গিয়া মধ্যাহ্নে মার সঙ্গে মাঠে ঘুরিয়া ফিরিয়া ১০½ কি ১১টায় বাড়ী ফিরিতাম। কোন কোন দিন ১২টা ১টা বাজিত। তখন মার সম্মুখে কোনদিন বসিতাম না। শরীর কেমন এক আনন্দে আপনা আপনিই সোজা থাকিতে চাহিত। কেহ বসিতে বলিলে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতাম। মা কোন কোনদিন কথাবার্ত্তা বলিতেন; কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি নিঃশব্দে থাকিতেন। আমিও নীরবে পিছু পিছু চলিতাম। একদিন এক বৃদ্ধ উকীল (৺অশ্বিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা) প্রাতে মাঠে বেড়াইতে আসিয়া মাকে বলিলেন,—"আমি তো তোমাকে দেখিতে আসি না, তোমার বাছুরটাকে দেখিতে আসি; শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, রোজ সকালে এতদূর হইতে আসিয়া তোমার পায়ে পায়ে চলে, তাহাকে দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আশীর্ব্বাদ করুন আমার বাকী জীবনটি যেন এ ভাবে কাটিয়া যায়।" বৃদ্ধ আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—"ধন্য তুমি।"

অনেকদিন দেখিয়াছি, শেষ রাত্রিতে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হইতেছে, যেই মায়ের নাম স্মরণ করিয়া রওয়ানা হইব, অন্ততঃ ঐ সময়ের জন্য বৃষ্টি কমিয়াছে। বৃষ্টিতে কি শীতের

ঘন কুয়াসায় প্রায় তিন বছর ধরিয়া প্রত্যহ সমানে মার সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে বাধা জন্মে নাই।

ঢাকাতে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মাসেক ধরিয়া চলিয়াছে। এ বিরোধ বাধিবার পূর্ব্বে মা একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ভীষণ!" কেন ঐরূপ বলিলেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন,—"আমি দেখিতেছি সহরের চারিদিকে ঘরে ঘরে হাহাকার।" পরে যখন বিরোধ ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল, এই বিভীষিকার মধ্যেও আমার আশ্রমে যাওয়া বন্ধ হয় নাই। প্রতিবেশী শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী আমাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে প্রায়ই বলিতেন "তুমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আবার তোমাকে দেখিব কিনা এই বিষয়ে আশঙ্কা থাকে। সহরে ছুরী মারামারি খুনোখুনী হইতেছে; এত ভোরে এ সময়ে বাহির হওয়া কি ঠিক?" আমি ভাবিতাম, যখন মা আমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিতেছেন না, তখন নিশ্চয়ই আমার কোন ভয় নাই। তাই আমি আমার ভাবে চলিতে লাগিলাম।

একদিন আশ্রমে চলিয়াছি। রাস্তার আলোগুলি তখনো জ্বলিতেছে। লোকজন পথে কেহ নাই। আমি ঢাকা ডাক-বাংলো ছাড়াইয়া প্রায় ১০০ গজ গিয়াছি এমন সময় দেখি কি একটি মেহগনি গাছের আড়াল হইতে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া এক বলিষ্ঠ লোক আমার পিছু লইল।

সে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—"আমি আপনার সঙ্গে যাইব।" আমি বলিলাম—"আমি তো রম্‌না আশ্রমে যাইব"। সে বলিল—"আমিও যাইব।" তখন আমার মনে ভয় হইল। এ ভাবে চলিতেছি, এক-বার পিছন করিতে দেখি সে আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ এমন সময় আমার মুখ হইতে চীৎ-কারের মত আওয়াজ হইয়া বাহির হইল—"না, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না।" এরূপ বলিয়াই আমি দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিলাম। এদিক ওদিক আর তাকাইতেছি না—অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দেখি —সে লোকটি কাঠের পুতুলের মত সেখানে ছিল, সে একভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রম্‌নার মাঠে পৌঁছিয়া দেখি,—স্নেহময়ী জননী আশ্রমের ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। আমি পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া ব্যাপারটি নিবেদন করিলাম। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কয়েকদিন পরে শুনিলাম সে অঞ্চলেই একটি খুন হইয়াছিল।

অভিযান

জীবন সংগ্রামে দেখা যায়—প্রথম প্রয়োজন লক্ষ্য, দ্বিতীয় প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প, তৃতীয়তঃ ঐকান্তিক আত্ম-নিয়োগ। এই ত্রয়ী সংযোগে কোন কাজ সম্পাদন করিলে আপাততঃ ফল দেখা না গেলেও, শুভকর্ম্মের সংস্কারগুলি বীজরূপে সঞ্চিত থাকে। সুযোগ পাইলে আপনভাবে তাহা বিকশিত হইয়া পড়ে।

কার্য্যে যোগদান করিবার পর প্রায় তিন বৎসর যাবৎ চাকরী করিলাম। একদিন আশ্রমে মা একটি ফুল হাতে পাঁপড়িগুলি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আমাকে বলিলেন,—"তোর তো অনেক ভাব ঝরিয়া গিয়াছে, আরো অনেক বাকী আছে। সব যাইয়া এই পুষ্পদণ্ডটির মত কেবল সূক্ষ্ম শক্তিরূপে আমি তোর ভিতর থাকিব, বুঝ্‌লি!" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, —"মা কি উপায়ে আমার সেই অবস্থা আসিবে?" মা বলিলেন—"রোজ এই কথাটি একবার স্মরণ করিস্ আর কিছু করিতে হইবে না"। সত্যসত্যই নিত্যকর্ম্মের মত এই চিন্তা মনের ভিতর বসিয়া গেল; আমার চিত্তের ছড়ানো ভাব গুলি ক্রমে একমুখী হইতে লাগিল। নানাদিকে মন ঘোরা-ফেরা করিলেও লক্ষ্যে লাগিয়া থাকিবার জন্য প্রাণে

প্রবল আগ্রহ চলিত। ইহাতে আমার প্রতীতি হইল অনেক জপধ্যান করিয়া বিবেক বৈরাগ্যের সাহায্যে মানুষ যাহা লাভ করে, মহাত্মাদের একটি সরল সহজ বাণীর অমোঘবলে সে সাফল্য হয়। ৬।৭ মাস পরে একদিন মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে—মা বলিলেন,—"দেখ তোর কর্ম্মজীবন ফুরাইয়া আসিতেছে।" আমি শুনিলাম বটে কিন্তু প্রাণে তেমন গভীর ভাবে তাহা সাড়া দিল না। তখন আমাকে শ্রীমদ্ ভগবানচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ও প্রায় বলিতেন—"তোমাকে তো বাপু, নিবার জন্য হিমালয় হইতে লোক আসিতেছে, প্রস্তুত থাক।" তাঁহার বাল-সুলভ প্রকৃতি, আমি ভাবিতাম বোধ হয় তামাসা করিতেছেন।

কয়েকমাস পরে আমি ৪ মাসের ছুটি নিলাম। কোনও পাহাড়ে হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাইব মনে করিতেছিলাম ইতি-মধ্যে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (২রা জুন ১৯৩২ ইংরাজী অব্দ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০॥টার সময় মা ব্রহ্মচারী শ্রীমান যোগেশকে দিয়া আমার বাড়ী হইতে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে যাইতে পারিস্ কি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় যাইতে হইবে?" মা বলিলেন—"যেখানে যাইনা কেন?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে বলিলেন—"চুপ করিয়া রইলি যে?" বাড়ীতে কাহাকে কিছু বলিয়া আসি নাই, কাজেই সংসারের টানে

বলিয়া উঠিলাম—"বাড়ী গিয়া টাকা পয়সা আনিতে হইবে তো ?" মা বলিলেন—'যা পারিস এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া নে।' মুখে "আচ্ছা" বলিয়া সায় দিলাম; কিন্তু প্রাণে পুত্র পরিবার উঁকি দিয়া বলিল—'কোথায় যাইতেছ ?'

যা হোক সঙ্গে এক কম্বল, এক কাঁথা, এক সতরঞ্জি, এক একখানা ধুতি নিয়া মা, পিতাজী ও আমি ঢাকা ষ্টেশনে রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনে পৌঁছিলে মা বলিলেন, "এ গাড়ী যতদূর যাইবে ততদূর টিকেট কর।" জগন্নাথগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করা গেল। পরদিন ওখানে পৌঁছিলে মা বলিলেন—"ওপারে চল্।" সে পারে গিয়া কাটিহারের টিকেট হইল। সঙ্গে টাকা কম, অপ্রত্যাশিত ভাবে কাটিহারে এক পুরানো বন্ধুর সহিত অচিন্ত্যনীয় ভাবে অকস্মাৎ দেখা হইয়া গেল। তিনি ১০০৲ টাকা, যথেষ্ট ফল ও খাবারাদি দিয়া দিলেন। সে স্থান হইতে লক্ষ্ণৌর টিকেট করিলাম। পথে গোরক্ষপুর নামিলেন। সেস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দিরাদি দর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হইলাম। পরের গাড়ী দেরাছুন এক্স্প্রেস ছিল। মা বলিলেন—"উহার শেষ পর্য্যন্ত টিকেট কর।" পরদিন প্রাতে দেরাছুন পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। নূতন জায়গা, নূতন লোকজন, নূতন সবই। মা বলিলেন—"আমি ত সব পুরাতনই দেখিতেছি।" কোথায় পরে যাইব কিছুই স্থিরতা নাই। আমি ও পিতাজী মধ্যাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে কালীবাড়ীর নাম শুনিয়া সেখানে গেলাম; সেখানে জানিলাম

৩।৪ মাইল দূরে রায়পুর গ্রামে একটি শিবালয় আছে ; স্থান খুব নির্জ্জন। মন্দিরটি একান্ত বাসের খুব উপযুক্ত স্থান। ঘটনাচক্রে রায়পুরের এক পণ্ডিতজী ঠিক সে সময় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়া পরদিন প্রাতে রায়পুরে গেলাম। পিতাজী স্থানটি দেখিয়া পছন্দ করিলেন। মাতাজীর মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন— "তোরা দেখিয়া শুনিয়া নে, আমার সবই ভাল।" ১৯৩২ সনে ৮ই জুন বুধবার প্রাতে দশটা হইতে মন্দিরে মা ও পিতাজী বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলী শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা হইলে দ্বিতীয়-খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপের ধারণা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত। যদিও সব সময় বলিয়া থাকেন—"আমি তো তোমাদের একটি পাগলী মেয়ে।" তবুও এই পাগলী মেয়ের সকল চলা-ফেরার অন্তরালে, তাঁর চিরমধুর লীলা-খেলার পশ্চাতে, ভগবতী শক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ ধরা পড়ে।

পাশ্চাত্য মনীষী এমারসন (Emerson) বলিয়াছেন—"সংসারে থাকিয়া গৃহধর্ম্মের অকুন্ঠিত অনুষ্ঠান করা কিংবা নির্জন গিরিগুহায় বসিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া সহজ। কিন্তু প্রকৃত সত্যে এবং মহত্বে প্রতিষ্ঠিত তিনিই, যিনি জনতার সহস্র সংঘাতের মধ্যে নিরাশার স্বাধীনতা ও পূর্ণ মাধুর্য্য লইয়া বিরাজ করিতে পারেন।"

শ্রীশ্রীমা লোক কোলাহলের সহস্র বিক্ষোভের মধ্যে দিবা-রাত্রি বাস করিয়াও নিজের অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা চির নির্ম্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টি, চির হাস্যমুখর লীলায়িত জীবনের অবাধ গতি সকল জীবের সহস্রমুখী ভাবরাশির তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। তাহাতে তাঁহাকে বিশ্বজননীর মূর্ত্ত প্রকাশ বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

মাকে কেহ বলেন—'সাক্ষাৎ ভগবতীর অবতার,' কেহ 'জীবন্মুক্তা সাধিকা' মা'। আমাদের মনে হয়—"যার চোখে তিনি যেমন তিনি তাহাই।" প্রথম দর্শনেই তাঁহার সার্ব্ব-জনীন শান্তমধুর ভাবের স্পন্দনে নিতান্ত ধর্ম্মবিমুখ জীবের প্রাণেও ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তাঁহার সান্নিধ্যে সর্ব্বদা শুষ্ক প্রাণেও ভগবৎ ভাবের স্ফূর্ত্তি জাগ্রত হয় এবং এক বিরাট সত্তার স্পন্দন সমুদ্রের অন্তহীন অশান্ত কল্লোলের মতো জীব হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

মায়ের দীক্ষা বা গুরু সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করাতে মা বলিয়াছিলেন। "শৈশবে পিতামাতা, গার্হস্থ্যজীবনে পতি, এবং সকল অবস্থায় জগন্ময় সবই আমার গুরু ; তবে জানিয়া রাখিও গুরু বলিতে একমাত্র স্বয়ং একই।"

লৌকিক দৃষ্টিতে মা যেরূপ আদর্শ কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে প্রকাশিতা, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাঁহার বাণীর মধ্যে রাজযোগাদির বিবিধ ধারা, সাধনার বিচিত্র পথ, দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা মত পরিস্ফুট। কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার সে সকল ভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলাও চলে ; শিব দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাদিরূপ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে কিংবা বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহার যে সহজাত কুশলতা লক্ষিত হয় তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদেব-দেবীময়ী পরমদেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধনাদি ব্যতিরেকে জীবনের প্রথম হইতেই নিত্যকর্ম্মের

মত যে সকল অলৌকিক বিভূতি তাঁহার ব্যবহারে কতই দেখা গিয়াছে তাহাতে তাঁহাকে পরম: যোগী বলা যায়। সে সকল সূক্ত ও স্তবাদি বৈদিক ভাষায় তাঁহার বাণী হইতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতে কাহারও দ্বিধা হয় না।

জ্ঞানমার্গে, ভক্তিপথে, কর্ম্ম নৈপুণ্যে তাঁহার স্বচ্ছন্দ অনুভবজাত সিদ্ধান্ত অনেক প্রাচীন ও প্রবীণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাবের সাধনায় যাঁহারা উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের পার্থক্য এই যে তাঁহাতে একাধারে এই সকল খণ্ডভাবগুলির এক অনুপম সমন্বয় ঘটিয়াছে। তদ্দ্বারা অহরহ জীবের কল্যাণ সাধিত হইতেছে।

তাঁহার সৌম্যমধুর মূর্ত্তি, তাঁহার ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সরলতা, এবং চিরপ্রসন্ন কৌতুকময়ী লীলাবিলাস, তাঁহার অনাবিল কল্যাণবর্ষী দৃষ্টি, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি করুণা-কোমল সমভাব, তাঁহার দ্বন্দ্বরহিত নিত্যমুক্ত স্বভাব এই যুগে অনুপম, অতুলনীয়। তাঁহাকে সাধিকা বলা যায় না; কারণ শিশুকাল হইতে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, সকলেই বলেন তিনি শিশুকাল হইতেই কর্ম্মে ও ভাবে এক ধারায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কোন সাধন-প্রচেষ্টা কখনো কেহই লক্ষ্য করেন নাই।

সকল সময়ে সকল অবস্থায় তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া যে সকল লৌকিক বা অলৌকিক ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ হয় তাহা ভক্তজনের কল্যাণের জন্য স্বতই স্ফুরিত হইয়া থাকে।

তাহা তাঁহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা সাধন চেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। উর্জ্জস্বল হোমশিখার মধ্যে যখন হবিধারা নিক্ষিপ্ত হয়, অগ্নির স্বাভাবিক নিয়মে অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, হবির্গন্ধে দিক পূত ও আমোদিত হইয়া যায়, একটু পরে আহুতির কোন চিহ্ন যজ্ঞশিক্ষায় দেখা যায় না—শিখা চির নির্ম্মল একধারায় জ্বলিতে থাকে। তেমনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণপুটে ভক্তজনের নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলির স্পর্শে মাতৃস্তন্যের মতো স্বতোৎসারী স্নেহধারায় তাঁহার বাণী, তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার আনন অভিষিক্ত হইয়া ওঠে, প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে এবং পরক্ষণেই তাঁহার সহজাত প্রশান্ত সৌম্যভাবে সকলিই মিশিয়া যায়।

ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব তাঁহাতে নাই। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কোন খেলা তাঁহার কোন ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া স্ফুরিত হয় না। বিশ্বজগতের কল্যাণকল্পে সকল ধর্ম্মের, সকল কর্ম্মের ভিত্তিরূপে যে সনাতন সত্য, অনাদি কাল হইতে মানবচিত্তে স্বপ্রকাশ হইয়া আসিতেছে, সেই সত্যধর্ম্মের জ্যোতি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার আভাষ, তাহার ইঙ্গিত তাঁহার সকল কার্য্য ও অনুষ্ঠানে প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে। তাঁহার জীবনে ইহাই প্রতিভাত হয় আপনাকে না হারাইয়া

কিরূপে মানুষ লোক-ব্যবহারাদি রক্ষা করিয়াও অধ্যাত্ম পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে দলে দলে যে সকল লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সাধুসন্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের দ্বারা জীব জগতের কিছু কল্যাণ অনুষ্ঠান সাধিত হইতেছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। গৃহধর্ম্মের ও সমাজ ধর্ম্মের বাহিরে গিয়া গৃহধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মের সাধন-পথ সুগম করা বড় সহজ নয়। নির্জ্জন গিরিকন্দরে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া কেহ কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই উচ্চতর অবস্থার দ্বারা দেশের জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার ধারা অনেক সময় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তাঁহাদের জন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়, মঠের চূড়ায় আকাশ বিদ্ধ হইয়া উঠে, পূজা আরতির ঘটায় দিক্ দিগন্ত মুখরিত হইয়া যায়, অন্নসত্রের চারিপার্শ্বে বুভুক্ষু মক্ষিকার মতো কাঙালের দল ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু এত অর্থ ব্যয়ে ও চেষ্টায় যে আশ্রমের ভিত্তি গড়িয়া উঠে, তাহার প্রভাবে মানব-সমাজ জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে সমর্থ হইতে পারে না—সমাজ দিন দিন ঈর্ষা দ্বেষ, কলহে জীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে; সমাজের মধ্যে সাধনপরায়ণ সবল প্রাণের খেলা অবাধ গতিতে খেলিতে পারে না। যে সাধনার বলে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হয়, যাহার প্রভাবে জীব ঐশী সম্পদ লাভ করিয়া সমর্থ হইয়া উঠিতে পারে, সমুদয় ব্যক্তিগত

স্বার্থ নির্ম্মলতা লাভ করিয়া পরার্থে পরিণত হইতে পারে, সেই সাধনার ক্ষেত্র বর্ত্তমান যুগে দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের হিতের জন্য সর্ব্বদা উদগ্র হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দেহের ভার সকলের উপর ন্যস্ত করিয়া দিয়া, নিজের সকল প্রকার দেহ চেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে জাগতিক কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ব্যবহারিক হিসাবে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই, সকল স্থানই তাঁহার আপনার স্থান, সকল জীবই তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তান ও বন্ধু। তিনি বলেন, 'আমি দেখিতেছি জগৎময় একটি বাগান, তোরা এই বাগানে ফুলের মতো ফুটিয়া রহিয়াছিস্; আমি এই একই বাগানের এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি মাত্র।"

আর এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার নিজের কিছু করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই; আগেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না। যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে বা পাইবে সবই তোমাদের জন্য; এ শরীরের নিজস্ব বলিয়া যদি কিছু বলিতে চাও তবে জগৎময় সবই নিজস্ব।"

সৃষ্টি লীলার অপার বিভূতি যে মাতৃভাবের দ্যোতনায় জগৎ চরাচরে দীপ্তিমান হইয়াছে, সেই অখণ্ড মাতৃভাবের

সর্ব্বতোমুখী প্রকাশ শ্রীশ্রীমায়ের সকল কথায় ও কার্য্যে, সকল লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়। ভক্তজনের নিকট শিশু-কন্যার মতো আবদার, শরণাগত আর্ত্তের প্রতি মাতৃরূপে বরাভয় প্রদান, সকলই একই মহাশক্তির কার্য্য।

জগতের সকল ধর্ম্মে, সকল বর্ণে ও জাতিতে, সকল আশ্রমে, সকল নিয়মে, সকল শিক্ষায়, তিনি সর্ব্বভাবে সম-শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি বলেন, "সর্ব্বধর্ম্মই একধারা, সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।" কেহ কোনদিন জিজ্ঞাসা করিলে—"আপনি কোন জাতি? বাড়ী কোথায়?" মা হাসিতে হাসিতে এই জবাব দেন—"ব্যবহারিক হিসাবে ধরিতে গেলে—এ শরীর পূর্ব্ববঙ্গের, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ সকল কৃত্রিম উপাধি হইতে আলগা করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে—"এ শরীর তোমাদের সকলেরই পরিবারভুক্ত"।

কখনো মাকে বলিতে শোনা গিয়াছে,—"এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর্। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটাইয়া দিবে।" কখনো আবার বলেন,—"আমি তো কিছুই জানিনা, তোরা যা' শুনাস্ তাই তো আমি বলি।" কখনো আবার বলেন,—"এই শরীরটা তো একটা পুতুল, তোরা যেমনি খেলাতে চাস, তেমনি তরো খেল্‌তে থাকে।'

তাঁহার এই সকল বাণী হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়,

শ্রীশ্রীমার এই শরীরে জগৎ চরাচরের অন্তরালের প্রচ্ছন্ন শক্তি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। জগৎময় পরমার্থ শক্তি হইতে তাঁহার সকল চেষ্টা উদ্‌গত হইতেছে। আবার তাঁহাতেই সব বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। দ্বৈতবোধ তাঁহার চলিয়া গিয়াছে। তিনি এক একবার বলেন,—"একমাত্র তুমিই সব, বা একমাত্র আমিই সব।"

আর একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি তো তুমিই, এক মাত্র তিনি আছেন বলিয়াই তো আমি, তুমি।" মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করিয়া যে বলিতে পারিবে—"মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না,"—তবে সত্য সত্যই মা নিজস্বরূপে তাহাকে দেখা দিবেন, তাঁহার স্নেহময় অঙ্কে তাহাকে তুলিয়া লইবেন। দুঃখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাঁহাকে কোন রহস্যময়ী আশ্রয় ভাবিও না। মনে রাখিও তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণশক্তির মত বিদ্যমান আছেন। তা'হলে তোমার আর কিছুই করিতে হইবে না। তিনি তোমার সকল ভার লইবেন।
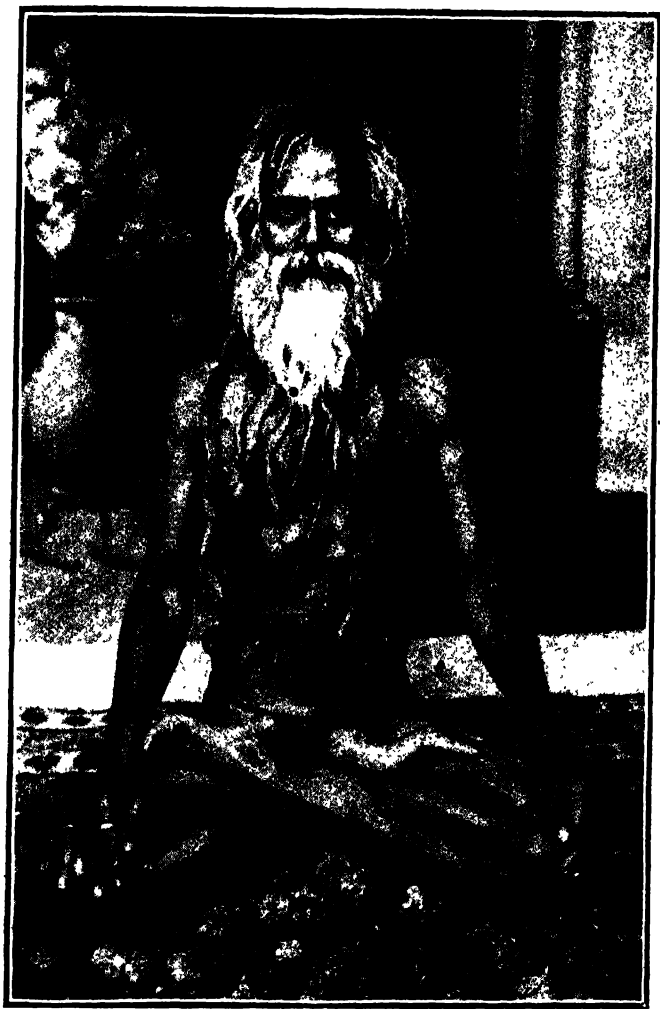
শ্রীশ্রীপিতাজী [১৬৭ পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীপিতাজী

পিতাজী আমার উপর নানাভাবে এবং আমাকে ধর্ম্মপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার অহৈতুকী করুণা প্রকাশ করিয়া আমার জীবন ধন্য করিয়াছেন। প্রথম দর্শন হইতেই পিতাজীর স্নেহলাভ করিয়াছি। ইহাই আমাকে প্রতিপদে সংরক্ষিত করিয়া আমার ভাবযোগে আমাকে মহাগুরুর মতো পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। এক সময় মনে করিতাম মাকে না পাইলে বাবাকে পাওয়া যায় না; কিন্তু আজ বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বাবাকে পাইয়াই বাবার অসীম দয়ার দ্বারাই মাকে পাইয়াছি। লৌকিক হিসাবে বলিতে গেলে তাঁহার সর্ব্বজনহিতৈষী মহত্ব ও করুণা ব্যতিরিকে মার দর্শনলাভ কাহারও অদৃষ্টে ঘটিত না। এমন অনেক সাধু মাতাজীর কথা শোনা যায় যাঁহারা তাঁহাদের পতিদেবতার প্রতিকূলতায় অন্তঃপুরের ঘেরাবেড়ার ভিতর ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা সংসারক্লিষ্ট জীব, বহুদুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বলতা লইয়াই সংসার-পথে চলিয়া থাকি; পিতাজী আমাদের চিত্তের নানা মলিনতা দেখাইয়া দিয়া আমাদের মন নির্ম্মল করিয়া লইয়াছেন। আমার দারুণ দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণায় আমার জন্য

তাঁহার অহর্নিশ ঐকান্তিক শুভচিন্তা ও আশীর্ব্বাদ আমার পুনর্জ্জীবন দানের প্রধান উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি একদিন ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী আসনে গেলে আমার পূর্ব্ব ব্যাধি পুনরায় দেখা দিবার আশঙ্কায় পিতাজী ভাবাবেশে হঠাৎ আমাকে টানিয়া নিয়া মার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার ছেলে তোমার কোলে দিলাম, এখন তাহার রক্ষার ভার তোমার উপর।"

শ্রীশ্রীমার মুখে শুনিয়াছি, বহুবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপিতাজীর ভ্রূমধ্য হইতে এক জ্যোতিরশ্মির প্রকাশ তিনি দেখিয়াছিলেন। জপে, তপে, যজ্ঞে ও পূজায় পিতাজীর একগ্রতা ও এক-নিষ্ঠতা অসাধারণ।

পিতাজীর ভিতর কি যে এক অপরূপ অন্তর্নিহিত শক্তি নীরবে কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। তিনি সত্য সত্যই আশুতোষ; আপন আনন্দ সকলকে বিলাইয়া দিয়া, পরের আনন্দে যেন সদা সর্ব্বদা ভরপূর আছেন। যে তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছে সেই বলিবে তাহার চরিত্রে এক অপূর্ব্ব মধুরতা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার আশীষের জন্য সকলেই লালায়িত। বালকবালিকার সহিত তাঁহার হাসি কৌতুকের ছড়াছড়ি দেখিবার জিনিষ। তাঁহার শিশুর মতো সরল ভাব দেখিয়া শ্রীশ্রীমাতাজী তাঁহাকে

এস্থানে পিতাজীর একটি ছবি সন্নিবেশিত করা হইল।

"গোপাল" বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন; পিতাজীর হৃদয়ও এত উদার যে তিনি মাকে শক্তি-রূপে পূজা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। পিতাজী রাগী বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে আসিয়া একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইবে, তাহারা দেখিতে পাইবে বাড়বাগ্নি শিখার মূলে যেমন শীতল জলের প্রস্রবণ দেখা যায়, তেমনি তাঁহার আপাত প্রতীয়মান ক্রোধের অন্তরালে অপরিসীম স্নেহও করুণারনির্ঝর সতত প্রবহমান। পরের মঙ্গল কামনা, পরের হিত সাধনাই তাঁহার ব্রত, তিনি কাহাকেও বিমুখ করিতে জানেন না।

পিতাজী বলেন—ভোগ ও ত্যাগ একই মনের যমজ মূর্ত্তি। ইহা শরীরের বহিরাভরণের মতো। যতই জীব ঈশ্বর ভাবে বলীয়ান হইতে থাকে এই দুইয়ের অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলমূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতে থাকে।

এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যে পিতাজীর পদতলে বহু আর্ত্ত জীব পরমার্থ লাভের আশায় উপস্থিত হইবে।

নিজের কথা

আমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়, অনাত্মীয় এমন কি অপরিচিত অনেকের ভিতর হইতে আমার বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে বলিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে।

প্রথমতঃ বলা আবশ্যক, আমি কেন শ্রীশ্রীমাকে এত মান্য করি, তাহার উত্তর আমার কাছে নাই। তবে দেখিতে পাই তাঁহার নিকট হইতে সরিতে পারি কিনা এই প্রশ্ন আমাকে কেহ করিলে আমি নির্ব্বাক্ হইয়া যাই। আমার মন প্রাণ তাঁহার চরণ-যুগল আশ্রয় করিয়া দিবানিশি পড়িয়া থাকে। একএক সময় বোধ হয় তাঁহার চিন্তা স্থগিত হইলে, আমার জীবনের ধারাও শেষ হইয়া যাইবে। আমার কোন পারমার্থিক প্রয়োজন সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নাই। লোকের যে ধারণা আমি রোগমুক্ত হইয়াছি বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছি— এ কথাও সম্পূর্ণ ভুল। তাহার নিত্য প্রকাশলীলা অজস্র বিভূতির আকর্ষণ যে আমাকে তাঁহার দিকে টানিয়া রাখে তাহাও নয়। তাঁর বিশ্বতোমুখী প্রভাব স্বতঃস্ফুরিত হইয়া আমাকে যেন অসহায় শিশুর মত সকল রকমে জড়াইয়া রাখিয়াছে।

আর একটি কথা বলিতে পারি যে তাঁহার শ্রীপদ-পল্লবদ্বয় আমাকে যেরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ দান করে তাহার এককণাও পার্থিব ও অপার্থিব অন্যকোন বস্তু, এমন কি, দেবতাদি সাধনরূপ ক্রিয়া দ্বারা আমার হয় না। ইহাই আমার বন্ধন এবং এ বন্ধনই আমার পরম মুক্তি বলিয়া আমার ধারণা।"

মা বলেন—"আমিই তোকে সংসারগণ্ডী হইতে খানিকটা বাহিরে আনিয়াছি। তোর মত বিলাসপ্রিয় জীবকে সংসার হইতে তাড়াইয়া আনা সহজ ছিল না।" আমিও বেশ বুঝি আমার মনের যে ক্ষিপ্তাবস্থা, তাঁহার অহৈতুকী করুণা ব্যতীত তাঁহার আশ্রয়ে পড়িয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মা আরো বলেন—"কেহই বুঝে না যে শুধু ঘরবাড়ীর গণ্ডীর ভিতর পড়িয়া থাকিলে অনেক পূর্ব্বেই তোর দেহপাত হইত।" মার এ অমোঘ বাণীর সত্যতা আমি খুবই উপলব্ধি করি।

আমার স্ত্রী আমার সাধনপথে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। ইনি জন্মাবধিই খুব অভিমানিনী; ধনবান্ সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথম সন্তান বলিয়া আত্মমর্য্যাদা ও কৌলিন্যভাব ইঁহার মজ্জাগত। ইঁহার ৮।৯ বৎসর বয়সে যখন ইঁহাকে আমি প্রথম দেখি, তখনো যে নির্ম্মল সরলতার চিত্র আমার চোখে প্রতিভাত হইয়াছিল, আজো তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মার সহিত যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন মাতৃচরণ পূজায় তিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন। আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রারম্ভে তিনি সকলরূপে মাকে শ্রদ্ধা করিতেন; সম্প্রতি স্বীয় জন্মগত অভিমানবশে তাঁহার ভাব-বিদ্রোহ জাগিয়াছে, তিনি অন্তরালে পড়িয়া থাকিয়া নিজ প্রাক্তন ক্ষয় করিতেছেন।

আমি যতই মার চরণে বেশী বেশী শরণাগতি জানাইতে লাগিলাম, এবং ক্রমে ক্রমে সংসারের ও সমাজের দিকে আমার উদাসীন ভাব জাগিতে লাগিল, আমার স্ত্রীর চোখে আমার অতটা বৈরাগ্য ভালো লাগিল না। তিনি একদিন বলিলেন, "ঘরে বসিয়া কি ধর্ম্ম হয় না? ছুটাছুটি করিয়া শরীরের ওপর যথেচ্ছাচার করিয়া পুত্র-কন্যার প্রতি অমনোযোগী হইয়া এই ধর্ম্ম না করাই ভাল।" আমি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম যে সংসারের শিকল ছাড়াইবার উপক্রম করিতে গেলেই সংসারের চোখে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল প্রতিপন্ন হয়। বাস্তবিক সে আপাত উচ্ছৃঙ্খলতার পথ অবলম্বন না করিলে সংসারের আপাতমধুর ভোগাদি দূরে রাখিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়।

কিন্তু আমার এই প্রবোধবাক্যে কোন ফল হইল না। ১১।১২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— "আপনার যে রকম ভাব দেখিতেছি, আপনার বাহিরে

থাকা বা ঘরে থাকা, উভয়ই আমাদের পক্ষে সমান।” আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—“যদি সন্ন্যাসী হইয়া আমি চলিয়া যাই, তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না তো?” তিনি অভিমানভরে জবাব দিলেন—“নিশ্চয়ই না।” পুত্র-কন্যা তখন ছোট, তাহারাও সেই স্থানে উপস্থিত ছিল। আমি একটি নোট বইতে উহা লিখিয়া রাখিলাম। এরূপ কথা আমাদের মধ্যে অনেক সময় হইত। ৺নিরঞ্জন তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতে তাঁহার প্রাণ শান্ত হইত না।

ইহার পরে আমার পূর্ব্বকথিত দারুণ রোগ হইল। দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যায় অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সহিত নিজের দেহের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তিনি অক্লান্তমনে মাসের পর মাস আমার পরিচর্য্যা করিয়াছেন। এমন একনিষ্ঠ সেবা, নীরবে সকল প্রতিকূল অবস্থার সংঘাত সহ্য করিয়া অকুণ্ঠিত ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করিয়া রাখা খুব কমই দেখা যায়।

আমি রোগমুক্ত হইয়া যখন আবার কর্ম্মজীবন সুরু করি, তাহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পরম স্নেহভাজন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাতে তাঁহার চিত্ত একেবারে দমিয়া যায়। তারপর হইতে তিনি সব বিষয়ে নিরুৎসাহী হইয়া পড়িলেন। মার প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণ পূর্ব্বেও তাঁহার ভাল লাগিত না; এখন হইতে

এই বিষয়ে তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া গেল। ছেলেমেয়েরাও তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া উঠিল।

তাঁহাদের বোধ হইতে লাগিল আমি যেন তাঁহাদের হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছি। শুধু তাঁহারা কেন, আমার আত্মীয়-স্বজনেরাও আমার আচরণ বিসদৃশ মনে করিতে লাগিলেন। এমন কি আমার অগ্রজ ৺ সতীশ চন্দ্র রায়, যাঁহার সহিত আজন্ম আমার এক প্রাণ, এক ভাব ছিল, যিনি শাস্ত্র, নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতেন,—তিনি একদিন লিখিয়া পাঠাইলেন "তুমি কোন পথে অগ্রসর হইতেছ বুঝি না, স্ত্রীলোকের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া কেহ কোনদিন পরমার্থ লাভ করিয়াছে বলিয়া পুরাণ ইতিহাসে লেখে না; ভয় হয় তোমার ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা না হয়!"

আমি দেখিলাম, আমার নিজের অবস্থা যখন নিজেই বুঝি না অপরকে বুঝাইব কেমন করিয়া? তাই মার উপলক্ষে আমার সকল কথা স্থগিত হইয়া গেল। ফলে এই দাঁড়াইল সকলেই—বিশেষতঃ স্ত্রী একেবারে মর্ম্মাহতা হইয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং আমার আচরণ অবৈধ বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

লৌকিক ধর্ম্ম ও সমাজের চোখে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য; এমন কি স্বর্গে যাইয়াও এককে অপরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় এই জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে। কাজে

কাজেই এরূপ অটুট বাঁধুনীর শৈথিল্য দেখা দিলে প্রাণের উচ্ছ্বাস ঘূর্ণীবায়ুর মত ক্রীড়াশীল হওয়া. খুবই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। আমি নীরবে সব বিরুদ্ধ ভাব সহ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। সর্ব্বদা মার নিকট আবেদন করিতাম—“মা, ইঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দান করিয়া শান্ত করো।” ইঁহাদের ব্যবহারে আমি ব্যথিত হই নাই, বরং তাহা দ্বারা সংসারের খেলাধূলার আকর্ষণ হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার অবকাশ আমি লাভ করিয়াছি।

সংসারকে মিথ্যা বলিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া আমার কোনদিন লক্ষ্য ছিল না। আমার শিক্ষাও তাই ছিল। যতক্ষণ আমি সত্য, ততক্ষণ সবই সত্য। তবে যে মূল সত্ত্বাকে ভিত্তি করিয়া সকলের সত্ত্বা প্রকাশমান, সে ভগবৎ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সংসারের সাময়িক বিচ্ছিন্নতা বয়সোযোগী কার্য্যকরী হয়। কেননা ঈশ্বর চিন্তারূপ ঔষধাদি সেবনের সহিত সময়ানুযায়ী একান্তবাসরূপ পথ্যও নিতান্ত দরকার। লোকে বলে তুমি আমাদের ছাড়িয়া গেলে। কিন্তু আমি দেখি ছাড়িলাম কৈ? একমাত্র শরীরের দূরত্ব ব্যতীত যেখানে ছিলাম সেই খানেই তো পড়িয়া রহিয়াছি। চির-জীবন কূপমণ্ডুকের মত এক নিগড় আবেষ্টনীর মধ্যে চলিতে কোন শাস্ত্রনীতিই সমর্থন করে না।

আমি আমার স্ত্রীর কথা যখনই ভাবি, তখনি মনে হয় তাঁহার সকল প্রতিকূল চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য তাঁর পতি পুত্রের

ভাবি মঙ্গল। তিনি ব্যবহারিক হিসাবে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতি ভাবে ও কার্য্যে বিরুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীমায়ের উগ্র সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন।

তাঁহার যেরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে যেরূপ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা, চিত্তের যেরূপ অনাবিল সরল ভাব, তাহাতে মনে হয় আপাত বিরুদ্ধ ভাবের কঠোর সাধনার দ্বারা তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যাইতেছে এবং তিনি ধর্ম্মজীবনে আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া মাতৃচরণে উপস্থিত হইবার জন্য অজ্ঞাতে ধাবিত হইতেছেন। মাও মনে করেন তিনি আমার অনেক আগে মাতৃচরণে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীশ্রীমায়ের পরলোকগত ভক্তগণ

বাঙ্গালা আর বাঙ্গালার বাহিরে শ্রীশ্রীমায়ের অনেক ভক্ত রহিয়াছেন, যাঁহারা জীবিত; তাঁহাদের কথা হয়ত এক সময়ে না এক সময়ে মায়ের বিবিধ লীলা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইতে পারে। যাঁহারা ইহধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য যাহা জানা আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

৺নিরঞ্জন রায় ও তৎপত্নী ৺বিনোদিনী দেবী। ইঁহারা উভয়েই মায়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধালু ও অনুরক্ত ছিলেন। বাহিরে তাঁহাদের কোন ভাবের প্রকাশ ছিল না। ৺নিরঞ্জন আমার সঙ্গেই মায়ের দরবারে উপস্থিত হইতেন এবং দূরে থাকিয়াই মায়ের স্নেহকরুণ দৃষ্টি লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার পরিবারে মায়ের পরিচয় ছিল "সাধিকা মা"। কিন্তু তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মাকে দেবী ভগবতীরূপাই মনে করিতেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৺নিরঞ্জন ঢাকা আসিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্ত্রী উৎকট হৃদ্‌রোগে পীড়িতা এবং ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা কম বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মাকে এ সম্বন্ধে নিবেদন করাতে কিছুদিন পরে মা হঠাৎ বলিলেন,—"ইহাকে ত্রিগুণান্বিত কিছু পরাইয়া দে।" রূপা, তামা, সোণা মিশাইয়া একটি সরুতাগা তাঁহার হাতে দেওয়া

হইয়াছিল। আমার ধারণা, ইহার পর যে তিন বছর তিনি বাঁচিয়া ছিলেন মায়ের দয়াই তাহার একমাত্র কারণ।

তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর মারা যান, তৎপূর্ব্বে বৈশাখ মাসে মায়ের জন্মোৎসবের সময় তিনি মাকে বলিয়াছিলেন,—"আমি গতবৎসর উৎসবে যোগ দিয়াছিলাম, এবারকার উৎসব দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না।" বলিলেন—"চলো, তুমি আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে আমার কাছে রাখিব।" তখন তিনি একেবারে শয্যাশায়িনী; এই অবস্থায় তাঁহাকে নড়াচড়া করিতে দিতে কেহই রাজী হইলেন না। আমার বিশ্বাস, মায়ের কৃপার আহ্বান যদি সানন্দে গ্রহণ করা হইত, হয়ত, তাঁহার রোগের গতি অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইত। তিনি পরে একেবারে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। মা তাঁহাকে প্রত্যহ একবার দেখিতে আসিতেন। কোনও দিন বৃষ্টিবাদল দেখিয়া মা আসিবেন না এ আশঙ্কায় তিনি রোগশয্যায় বসিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। কিন্তু জননীর এত করুণা, যে যেরূপেই হউক তিনি কিছুক্ষণের জন্য হইলেও তাঁহাকে একবার প্রতিদিন দর্শন দিতেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর ৺নিরঞ্জনের শরীর ক্রমশঃ শীর্ণতর হইতে লাগিল। তিনি রোজই ঢাকা বুড়ীগঙ্গার পারে শ্মশানে গিয়া, স্ত্রীর চিতার নিকট বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে অনেক রূপে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হই।
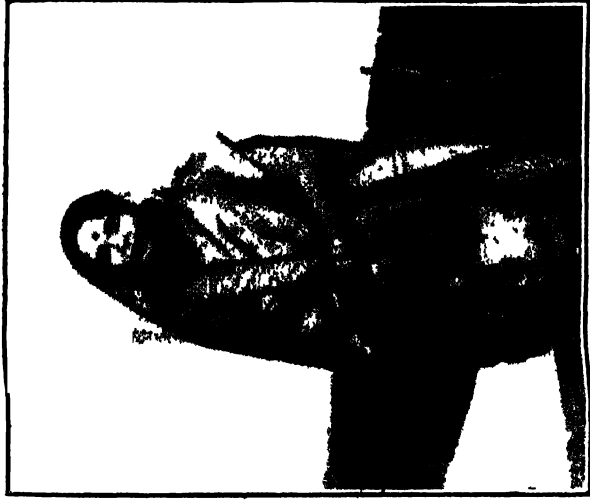
কুলবধূর বেশে শ্রীশ্রীমা ১৩৩৭ বাং

শ্রীশ্রীমায়ের পার্শ্বে ৺বিনোদিনী দেবী

১৯২৮ ইং

[১৭৮ পৃষ্ঠা

একদিন মাকে তাঁহার অবস্থা জানাইলে মা তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া শ্মশানে গেলেন। সেখানে যাওয়া মাত্র ৺নিরঞ্জন মার পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বেদনাতুর শিশুর মতো তাঁহাকে মা বুকে নিয়া অনেক প্রবোধ দিলে তাঁহার ক্রন্দন থামিয়া গেল। মা তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি একটা কথা মনে রাখিও—শ্মশানে সর্ব্বদা আসা ভাল নয়"। কিন্তু প্রাক্তনবশে তিনি মায়ের সেই উপদেশ পালন করিতে পারেন নাই। মাকে তাহা জানানো হইলে মা বলিলেন—"তোরা তাহার কিছু করিতে পারিলি না" এই বলিয়া নীরব হইলেন। ইহার পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুন তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ একটি ধারণা হইয়াছিল যে—তিনি পূর্ব্বজন্মে ৺হরচন্দ্র গিরি ছিলেন, যিনি ঢাকাতে রম্‌না ৺ভদ্রকালী মঠ স্থাপন করেন এবং বর্ত্তমান কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ ছোট মন্দিরটিতে যাঁহার সমাধির উপর শিব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন"।

৺প্রমথনাথ বসু—ইনি প্রথমতঃ ঢাকায় ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন, পরে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়া চলিয়া আসেন। মার প্রতি তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা উভয়ে ঢাকা থাকা কালীন প্রত্যহ সন্ধ্যায় মার নিকট যাইতেন এবং যতক্ষণ থাকিতেন ইষ্টচিন্তায় কাটাইতেন। মার কাছে বসিয়া ভগবৎ চিন্তায় বড় একাগ্রতা আসিত বলিতেন। একবার তিনি

রবিবারের ছুটিতে মৌনব্রত নেন। কি ভাবে ব্রত আরম্ভ করিবেন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যান। সোমবার সকালে দেখা গেল তাঁহার মৌন খুলে না। বাড়ীতে সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সেদিন আফিসও আছে। তাঁহার ছেলে তাড়াতাড়ি শাহ্‌বাগে ছুটিয়া গিয়া মাকে লইয়া আসিল। মা মৌন খুলিবার উপায় বলিয়া দিলে, তিনি তদনুযায়ী ক্রিয়া করিয়া কথা বলিতে সমর্থ হন। তারপর হইতে তিনি সপ্তাহে ২।১ দিন মৌন থাকিতেন, সে সময়ে লেখাপড়া বা ঈসারা ঈঙ্গিত কিছুই করিতেন না।

শাহ্‌বাগে প্রথম পৌষ সংক্রান্তির কীর্ত্তনের সময় যখন অপরাহ্ণে মা ভাবাবেশে বসিয়া "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গাহিতেছিলেন, তখন ৺প্রমথবাবু ভাববিহ্বল অবস্থায় হস্ত-সঞ্চালনে মার আরতি করে, তাঁহার দুই চোখ দিয়া দরদর বেগে অশ্রুধারা বাহিয়াছিল। সে সময় আশীর্ব্বাদের ধরণে মার শ্রীহস্ত যাইয়া তাঁহার মাথার উপরে পড়ে। একবার মা ৺প্রমথবাবুর কলিকাতার বাড়ী গিয়াছেন; সন্ধ্যায় চলিয়া আসিবেন, ৺প্রমথবাবু বলিলেন—"কিছুতেই হইবে না"। এই বলিয়া ছাদের উপর জপে বসিয়া গেলেন এবং ক্রমশঃ এমন স্থির হইয়া গেলেন যে সকলে মনে করিতে লাগিল যেন তাঁহার বহিঃসংজ্ঞা লোপ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, কিন্তু ৺প্রমথবাবু এক ভাবেই রহি-লেন। পরে মা কীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। ৺প্রমথবাবু

ভাবাবস্থায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া মাকে বলিলেন—“মা কেমন করিয়া যাইতে পারেন? এ ভাবের আত্যন্তিকতায় কোথায় গিয়া কি আনন্দে ছিলাম বুঝাইবার সাধ্য নাই।”

তাঁহার মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে আমি মার সহিত তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি তখন আমাকে বলেন—“আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে মহাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াও জীবনে কিছুই করিতে পারিলাম না। অর্থ-চিন্তাতেই দিন অতি-বাহিত করিলাম।” আমি বলিলাম—“এরূপ হতাশ হইতেছেন কেন?” তিনি বলিতে লাগিলেন—“ঢাকায় যখন সর্ব্বদা মার কাছে যাইতাম, একদিন খেয়াল চাপিল—মাকে সকলে কালী বলে, কালীমূর্ত্তিতে তো তাঁকে একদিনও দেখিলাম না। এ ভাবটি সর্ব্বদা মনে উঠিত। একদিন মা, পিতাজী ও আমি এবং আমার একান্ত বশম্প্রাণ চাপরাশি সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী যাই। পিতাজী শুইয়া পড়িলেন, মা বসিয়া রহিলেন। আমি ও আমার ভৃত্যটি বসিয়া জপ করিতেছিলাম। তখন মার কালীমূর্ত্তি দেখিবার বাসনা আমার মনে আবার জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল, কেশগুচ্ছ আলুলায়িত, দীর্ঘ জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে নয়ন বিস্ফারিত, যেন সাক্ষাৎ কালীমূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূতা, কাছে আর কেহ ছিল না। চাপরাশিকে জিজ্ঞাসা করিলাম

—তুমি কি কিছু দেখিতে পাইয়াছ ? সে বলিল—"আমি তো মার উপর দশ মহাবিদ্যার সব মূর্ত্তির খেলাই পর পর দেখিয়াছি।" আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"তোমার জন্ম সার্থক।" এসব কথা হইতে হইতে মা মাটিতে পূর্ব্ববৎ বসিয়া পড়িলেন। আমি তখন কতক্ষণ হতভম্ভ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক, এই সব অলৌকিক ব্যাপার যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ ; পরে আর বিশ্বাস থাকে না। আজ মায়েঁর শুভাগমনে অতীতের ঐসব ঘটনা স্মৃতি পথে জাগিতেছে বটে, কিন্তু এমনই মলিন চিত্ত যে তাঁহার উপর সে রকম দেবীভাবে শরণাগতি আসিতেছে না।"

৶ **বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক**—ইনি খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। মার কাছে বড় একটা যাইতেন না, তবে মার প্রসঙ্গাদি শুনিতে খুব আনন্দ পাইতেন। তিনি বলিতেন যে মাকে দেখিলে, তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত গতি বোধ হয়। ঢাকায় যখন প্রথম মুসলমানদের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তখন এক গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ মা আমাকে বলিলেন—"আমি দেখিতেছি যে জেলখানায় বসিয়া বৃন্দাবন 'মা মা' করিতেছে।" আমি বলিলাম "বোধ হয় ইহার বিপদ কাটিয়া গেল।" মা হাসিয়া উঠিলেন। আমি ৶ বৃন্দাবন বাবুকে বলিলাম, "আপনার আর কোন ভয়ের কারণ নাই।" বাস্তবিকই তাঁহার জেলে যাইতে হইল না। বোধ হয় তিনি মনের

জেলে বসিয়া 'মা মা' করিয়াছিলেন বলিয়াই বিপদমুক্ত হইয়াছিলেন।

৺ **নির্ম্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** :—ইনি থিয়োজফিষ্ট ছিলেন। প্রাণে প্রাণে মাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু মুখে সহজে প্রকাশ করিতেন না, যদিও তাঁহার অনেক কাজে ও ভাবে তাহা ফুটিয়া উঠিত ; মার সঙ্গ পাইলে তিনি ছাড়িতে চাহিতেন না। ইনি মুসৌরীতে মার সম্মুখেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী, শ্রীযুত শশাঙ্ক-মোহন মুখোপাধ্যায়ের (বর্ত্তমানে পূজ্যাস্পদ স্বামী শ্রীমদ্ অখণ্ডানন্দ গিরি) জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কেবল শশাঙ্কবাবুর পুত্রকন্যাগণ নয়, তাঁহার নিকট জ্ঞাতি-বর্গ এবং অন্যান্য আত্মীয়দের ভিতর অনেকেই মার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। এরূপ সংযোগ কদাচিৎ দেখা যায়।

একবার বেনারসে ৺ নির্ম্মল বাবু সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হন। ঢাকায় খবর আসে। মা সে সময় আপন ভাবে পড়িয়া ছিলেন। তিনি উঠিলে তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জানানো হয়। মা বলিলেন—"আমি তো তাহাকে এইমাত্র দেখিয়া আসিলাম।" ৺ নির্ম্মলবাবু সেবারে রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। পরে জানা গেল, যেদিন মা ঐ কথা বলিয়াছিলেন, সেদিন সে সময় বেনারসে ৺ নির্ম্মলবাবুর শিয়রে মাকে হঠাৎ একবার দেখা গিয়াছিল।

৺ **তরুবালা দেবী**—ইনি ৺ নির্ম্মলবাবুর একমাত্র কন্যা।

অল্প বয়সেই ইনি বিধবা হন। শৈশব হইতেই খুব সরল ও ধর্ম্মপ্রকৃতি বিশিষ্টা ছিলেন। বৈধব্যদশার পর মাদ্রাজ হইতে আনীত একটি হাতীর দাঁতের ছোট গোপালমূর্ত্তি, তাহাকে সেবা করিবার জন্য মা আদেশ করেন। তিনি অনুক্ষণ সে মূর্ত্তির সাজ সজ্জা ভোগ ইত্যাদিতে দিনাতিপাত করিতেন। গোপালজী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠমালার মত থাকিতেন। শুনিয়াছি তাঁহার ঐকান্তিকতায় গোপালজী তাঁহার সহিত মানুষের মত আদর আবদারের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি মাতাজীকে দেখা পাইলে ছুটিয়া আসিয়া শিশুর মতো জড়াইয়া ধরিতেন এবং আহার নিদ্রা ভুলিয়া মার উপদেশাদি শুনিতেন।

৺**দীনেশচন্দ্র রায়**—ইনি মার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। মার প্রসঙ্গ মার আলোচনা, মার উপদেশাদি শুনিয়া খুব আনন্দ লাভ করিতেন। ইনি যখন ঢাকা টাঙ্গাইলে মুন্সেফ ছিলেন, মা দুইবার সেখানে পদার্পণ করেন। একবার তথায় প্রকাণ্ড কীর্ত্তন হয় ও বহুলোকের সমাগম হয়। মার ভাবাবিষ্ট অবস্থা দেখিয়া ৺দীনেশবাবু বলিয়াছিলেন— "এতদিন মাকে দেবীরূপিণীই জানিতাম, আজ মার এ মহাভাব দেখিয়া মনে হয় তিনি সর্ব্বরূপেই সর্ব্বত্র বিরাজিতা আছেন।"

৺**ক্ষিতীশচন্দ্র গুহ**—ইনি অতিশয় নীরবকর্ম্মী ছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁহার অনুপম ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। সর্ব্বদা মা

নাম মুখে লাগিয়া থাকিত। পূজা পাঠে ধ্যান ধারণায় শ্রীশ্রীমাই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিলেন। মার প্রতি একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ ভাবে তাঁহার আদর্শ অনুকরণীয়। ইঁহার মৃত্যুর বছর খানেক পূর্ব্বে মা হৃষীকেশে ছিলেন এবং তিনি তথায় যাইবার জন্য মার অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখেন। তখন মার পূর্ব্ব আদেশ ব্যতীত মাকে সাক্ষাৎ করিতে প্রায় কেহ আসিত না। মা তাঁহাকে সপরিবারে তথায় যাইবার জন্য আদেশ দেন। তিনি হৃষিকেশ আসিলে মা আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন,—"ক্ষিতীশকে কেমন একটু বেশী চুপ দেখছিস্ না ?" মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে উনি তারাপীঠে গেলেও মা আমাকে ঐরূপ বলেন। তখন কে জানিত যে ইঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিতেছে বলিয়াই মার মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইয়াছিল ? মার সহিত উত্তর কাশী যাত্রায় ইনি, আত্মীয় স্বজনের বাধা ঠেলিয়া কোলের শিশুটিকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া দুর্গম কঠিন রাস্তায় মহা উল্লাসে যাতায়াত করিয়া সুস্থ শরীরে কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। ইহার প্রায় ৬ মাস পরেই মার চরণধূলি মাথায় লইয়া ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

৺অঙ্গনাসুন্দরী দেবী—ইনি শ্রীযুত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের (শ্রীমদ্ স্বামী তুরীয়ানন্দ) পত্নী। এমন পতিব্রতা, ধর্ম্মিষ্ঠা, সরলা ও স্নেহশীলা স্ত্রীলোক খুব কমই দেখা যায়। তিনি মাকে পাইলে বুকে রাখিবেন না তাঁহার চরণে পড়িয়া

থাকিবেন ভাবিয়া দিশাহারা হইতেন। ইনি একবার ঢাকা গেলে মাকে বলেন যে তাঁহার একছেলের কোষ্ঠিতে লেখা আছে যে দন্তাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে। কয়েকদিন পরে মা বিন্ধ্যাচল গেলে, তিনিও সেই ছেলে সমভিব্যাহারে তথায় যান। একদিন সকলে মিলিয়া পাহাড়ে বেড়াইতে গেলে, মায়ের পায়ে এক বিষধর সর্প দংশন করে। মার কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। তখন তিনি দুইবেলা সামান্য ফলাদি খাইতেন। কিন্তু উক্তদিন—"আমারে খায় সাপে, আর আমি খাই ভাত", বলিতে বলিতে অনেক ভাত তরকারী ও খিচুড়ী একাই গ্রহণ করিলেন। পরে জানা গেল যে ঐ সময়ে ঐ ছেলেটির ফাঁড়া ছিল।

৺নয়নতারা দেবী—ইনি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাতা। অতি বৃদ্ধ বয়সে মার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। মা কলিকাতা গেলে ইঁহার বাড়ীতে থাকিতেন। ইনি নিজে বাজারে গিয়া ভাল ভাল ফল তরকারী ইত্যাদি আনিয়া, নিজে রান্না করিয়া মাকে খাওয়াইতেন। মার সেবায় তাঁর অপরিসীম যত্ন ও আদর পরিলক্ষিত হইত। মাকে তিনি ইষ্টদেবীর মত জানিতেন।

৺সীতানাথ কুশারী—ইতি খুব ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি মার বিবাহের ঘটকালী করেন। বয়সে ইনি মার পিতৃদেব অপেক্ষা সামান্য বড় ছিলেন। কিন্তু

পরে মার উপর তাঁর এত গভীর শরণাগতি আসিয়াছিল যে সাক্ষাৎ দেবীরূপা মনে করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীচণ্ডী পাঠ করিতেন ও মায়ের পায়ে জোর করিয়া লুটাইয়া নমস্কার করিতেন।

৺**হরকুমার রায়**—ইনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টগ্রামে (মৈমনসিংহ) মার শ্রীচরণ দর্শন পান। ইনি খুব সরল ও ধর্ম্মপ্রাণ যুবক ছিলেন, তিনি বেশ নাম কীর্ত্তন করিতেন ও সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবে দিনাতিপাত করিতেন। মার সহিত সাক্ষাৎ-লাভের কিছুদিন পরে তিনি মাকে বলিয়াছিলেন—"আমি তো তোমায় মা ডাকি ; দেখবি মা, জগতের লোক তোকে মা ডাকিবে ; তোকে ত কেহই এখনো চিনিতেছে না।" মার বয়স তখন ১৮ বৎসর ছিল। ৺হরকুমার রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যে পরিণত হইয়াছ।

৺**মনোরমা মিত্র**—ইতি শ্রীযুত নিশিকান্ত মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী। মাকে ইনি দেবতার মত জানিতেন। এই পরিবারের সকলেরই মার প্রতি আত্যন্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে। ইহার এক নাতির কর্ণমূল হয়, ডাক্তরেরা জীবনের আশা নাই বলে। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী, শিশুটিকে মায়ের কৃপার উপর রাখিয়া দেন। ফোঁড়াটি দূষিত হইয়া কানের ভিতর দিয়া পচা পুঁয বাহির হইবার মত হইতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন শাহ্‌বাগ হাঁটিতে হাঁটিতে আলপিনের মত একটি ছোটপিন মার চোখে পড়ে, মা তাহা নিয়া হাসি খেলায় বাম হাতের

উপর কতকটা ক্ষতের মত করেন। তার পরদিন আপনা হইতেই ঐ ছেলেটির ফোঁড়াটি গলিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে শিশুটি সুস্থ হইয়া উঠে। মার হাতের উক্ত ক্ষতের ঘটনা পরে জানা গিয়াছিল। এখনো হাতে তাহার দাগ রহিয়াছে।

সমাপ্ত